

বিজনকুমার ঘোষ

অনেক



মজার



গল্প



৪'৪

অনেক মজার গল্প

643

বিজন কুমার ঘোষ

আশা বুক এজেন্সী
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী ঝর্ণা দত্ত
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশক ঃ—আশ্বিন ১৩৯৪

মূল্য—সাত টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
নারায়ণ প্রেস
১০৭/রাজারামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

মাদাগাসকারের কাক

অনিন্দ্যকুমার, ওরফে অনি। ছোট্ট মানুষটা। ছোট্ট শরীর। কিন্তু ওর মাথায় যত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা। সবাই যা বুঝবে, ও বুঝবে তার উল্টো। অনির মা এতে রেগে যায়। ওর কাকা বলে, এটা নাকি প্রতিভাবানের লক্ষণ।

অনিদের ইস্কুলে স্পোর্টস। অনি একশো মিটার দুশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে বসেছে। অনির দেহটি রোগা, ছিপছিপে, বাতাসের আগে আগে ছোটে। অনির বাবা বলেন, দুটোতেই ফার্স্ট প্রাইজ আনা চাই কিন্তু।

অনি এক গাল হেসে বলে, সে বলতে হবে না। ইস্কুলে আমার সঙ্গে কেউ পারে না। কিন্তু আমার দৌড়বার প্যান্ট নেই জুতো নেই যে—।

মাসের শেষ। তবু অখিলবাবু অনিকে নিয়ে কাপড়ের দোকানে গিয়ে ছিট কিনে দর্জির কাছে অর্ডার দিলেন। তাঁদের আমলে এসব হাঙ্গামা ছিল না। দিব্যি মালকোচা মেরে কাপড় পরে পদ্মা নদীর পার দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যেতেন। এখনকার ছেলেদের হালচালই আলাদা। জুতো পরে কে কবে ছুটেছে। তবু জুতোর দোকানে একবার যেতেই হল।

অনি রোজ সকালে নতুন জুতো প্যান্ট পরে অঙ্কুরিত ছোলা খেয়ে বুদ্ধ মন্দির পর্যন্ত ছুটে যায়, ছুটে আসে। একে প্র্যাকটিশ বলে। বড় প্রতিযোগিতায় নামার আগে এরকম প্র্যাকটিশ করে নিতে হয়।

লেক ময়দানে এক রবিবারে সকালে ওদের স্পোর্টস হবে। বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ছেলেদের খেলাধূলা দেখবার জন্যে অভিভাবকদেরও দেওয়া হয়েছে কার্ড। অখিলবাবুর রবিবারে মেলাই কাজ থাকে। তবু ঠিক করলেন, যাবেন। কেননা, অনিটা যেভাবে একাগ্র চিত্তে প্র্যাকটিশ করছে, তাতে রূপোর মেডেল না পেয়ে যায় না।

কিন্তু ও হরি! অনি যে এভাবে উল্টো বুঝবে তা কে জানত। বাঁশী বাজতেই সবার সঙ্গে অনিও পাতলা দেহটাকে উড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু একটু পরেই ভাবল, সবাই তো এক দিকে যাচ্ছে, আমি একটু অন্য দিকে যাই না। যাহাতক ভাবা অমনি উল্টো দিকে তীব্র বেগে ছুটে গেল অনি। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সামিয়ানার নিচে হাসির ঢেউ। অখিলবাবু হাসবেন কি উঠে যাবেন, কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বাড়ি ফিরলে মা বলে, শুনলে ঠাকুরপো তোমার প্রতিভাবান ভাইপোর কাণ্ড!

ময়লা কাপড় লনড্রিতে দেওয়ার তাড়া থাকায় কাকা একথার ঠিকমত উত্তর দিতে পারে না।

অনিদের ভাঁড়ার ঘরে পুরোনো জং ধরা একটা লোহার খাঁচা পড়ে আছে বহুদিন ধরে। একদা এখানে এক জোড়া ময়না বাস করত। দরজা খুলে খাবার দেবার সময় পাখিটা হঠাৎ একদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। সেই শোকে সাত দিন পর বৌটাও প্রাণত্যাগ করে। ইদানীং অখিলবাবু বলছিলেন, ওরে অনি রথের মেলা থেকে ময়না, কাকাতুয়া, কি বদরী যা হোক কোন পাখি কিনে নিয়ে আসিস। খাঁচাটা শুধু শুধু পড়ে আছে। কিন্তু অনির তাতে দারুণ আপত্তি। ময়না, কাকাতুয়া, বদরী তো সবাই পোষে। এর মধ্যে বাহাদুরি কি! যা কেউ কোন দিন ভাবেনি একেবারে নতুন জাতের পাখি পুষবে অনি, যে

কথা সেই কাজ। নতুন জাতের পাখির চিন্তায় অনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। একদিন ওর বন্ধু তপু হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল এই অনি, এক্ষুণি সরকারদের বাড়ির তেতালার ছাদে চ'। ওঃ, যা একখানা অদ্ভুত পাখি বাসা বেঁধেছে না—

দুজনে দৌড়তে দৌড়তে তক্ষুণি সরকারদের বাড়ির ছাদে চলে গেল। সত্যি, কার্নিসের ফোকরে বটগাছ, তাতে পাখির বাসা। তিনটি ছানা কিচমিচ করছে। গায়ে এখনো পালক গজায়নি। অনি চিন্তিত হয়ে বলল, কি পাখিরে ?

তপুর দাদা মশাই ছেলেবেলায় ভূগোলে একবার পঞ্চাশের ভিতর একচল্লিশ পেয়েছিলেন। সেই থেকে ওদের বাড়িতে ভূগোলের চর্চাটা বেশ জোর চলে। তপু ভারিক্কী গলায় বলল, তবে কি জানিস, এটা খুব রেয়ার পাখি। ঠোটের কায়দা দেখে মনে হচ্ছে, এদের আদি নিবাস ছিল মাদাগাসকার দ্বীপে—

বেচারা কথাটা শেষও করতে পারল না, 'বাপরে' বলে মাথায় ঠোক্কর খেয়ে দু'জনে ছিটকে পড়ল দু'দিকে। তাকিয়ে দেখল, দুটো পাঁতিকাক জেট প্লেনের ভঙ্গীতে ঠোঁট বাগিয়ে আবার তেড়ে আসছে। খোঁচা খেয়ে অনির মাথায়ও তখুনি বুদ্ধি গজাল। সে একটা ছানা তুলে নিয়েই চোঁ-চা দৌড়।

দু'দিন শান্তিতে কাটল। তৃতীয় দিনেই সরকার বাড়ির বাবা-মা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেল, তাদের খোকাকে এইখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সমস্ত কাক অনিদের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। কা-কা শ্লোগানে কান পাতে কার সাধ্যি!

অখিলবাবু বললেন, কি ঝামেলায় পড়া গেল, যা এক্ষুণি কাকটা ছেড়ে দে।

অনি বলল, কাক হলেও এটা মাদাগাসকারের কাক! এ আমি মরে গেলেও ছাড়তে পারব না।

আজকাল কাকেদের ঠোঁটেও নানা কাজ থাকে। একটা নিয়ে পড়ে

থাকলে ওদের চলেনা। অবশেষে ঘেরাও তুলে নিয়ে যে যার কাজে চলে যেতই অনিও হাফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এ ব্যাটা কিছুতেই কথা বলে না। আগেকার ময়না দুটো সুন্দর কথা বলত, কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ বল—। মাদাগাসকারের কাকটা নীরব কর্মী, শুধু খেয়েই যায়। খাওয়া না পেলেই কা কা করে। একটু দেরী হলে আবার র-ফলা যোগ করে, ক্রা-ক্রা—

ফলে বাড়িশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ। একমাত্র কাকাই ওর পক্ষে। বলে, দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত। এটা একটা নতুন আইডিয়া—

ফি বছর শীতকালে অনিদের পাড়ার পশু পাখি ক্লাবের পক্ষ থেকে ভারী মজার একটা প্রতিযোগিতা হয়। পশু বলতে বাঘ সিংহ নয়। কুকুর বিড়াল গরু ছাগল বেজি এই সব গৃহ পালিত পশুদের 'আই কিউ' অর্থাৎ বুদ্ধির মান পরীক্ষা করা হয়! তেমনি পোষা টিয়া, শালিখ, ময়না, হরিয়াল, চন্দনারা সেজেগুজে আসে। এখানে মানুষ দর্শক মাত্র। সেক্রেটারী বুবুলদা পশু পাখি ক্লাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তৃতা দেওয়ার পর প্রতিটি প্রতিযোগীর নাম করে জয়ধ্বনি দেওয়া



হয়। আই কিউ-তে ফার্স্ট হলে রূপোর মেডেল, সেকেণ্ড হলে সীসার ফলক আর থার্ড হলে মানপত্র—কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি নেই।

এখন মাথার ওপর মাদাগাসকারের কাক বসিয়ে অনি আসরে ঢুকতেই সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। —এ-মা, কাক আবার কেউ পোষে। অনির মাথাটা পুরো খারাপ!—এইসব মন্তব্যও কানে গেল। কিন্তু এতে ট্রেনিং প্রাপ্ত কাক কিম্বা কাকের মালিক কেউ এতটুকু ঘাবড়াল না। অবশেষে এই কাককেই রূপোর মেডেল পেতে দেখে সবার চোখ ছানা বড়া।

অনেকগুলো খেলা দেখাল মাদাগাসকারের কাক। তার মধ্যে একটার কথা না বললেই নয়। মাঠের মাঝখানে একটা হাড়ির খুব নিচে জল আর তার পাশে কিছু পাথর রয়েছে। অনি ছড়ি হাতে রিং মাস্টারের কায়দায় হুকুম দিল, জল খাও। কাকটা খুব চেষ্টা করেও জল খেতে পারল না। ওর চোখে মুখে তখন দারুণ হতাশা। এরপরে পায়চারি করতে করতে ভাবল কিছুক্ষণ। বুদ্ধিও এসে গেল। একটা একটা করে পাথর জলের মধ্যে ফেলতে লাগল। জলটা ওপরে ভেসে উঠতে কাক তাতে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। ওর তখন আনন্দ উপছে পড়ে। ছেলেবেলায় এটা সবাই গল্পে পড়েছে। এখন সেটা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখে নিজেদের সমলাতে পারল না কেউ। ঘন ঘন শ্লোগান উঠল, মাদাগাসকারের কাক জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ—

বাড়ি ফিরে অনির লম্ফ ঝম্প দেখে কে। বার বার বলতে লাগল, কেমন ট্রেনিং দিয়েছি দেখতে হবে তো! আমি মেডেল না পাই আমার কাক তো পেরেছে।

মা বলে, ছেলের কথা শুনলে ঠাকুরপো?

কাকা বলে, তোমাকে বলেছি না ও জিনিয়াস। নিজের অপূর্ণতা কাকের ভিতর দিয়ে পূরণ করে নিল। প্রতিভা ছাড়া এটা হতেই পারে না।



অনির কুকুর

অনি ইদানীং খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। প্রথমে কথাটা হাবুলের কাছে শোনে। কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। পুলিসের চরিত্র খারাপ হয়েছে—এ হতেই পারে না। পরে মার কাছেও একদিন কথা শুনতে হল, হ্যারে অনি আজকাল আমার পয়সা টয়সা চুরি হচ্ছে কেন রে? খোঁজ নে তো।

অনির প্রিয় কুকুরের নাম পুলিস। রাস্তা থেকে যখন ধরে এনেছিল বুকের সব ক'টা হাড়ই গোনা যেত বেচারার। সারা শরীরে একটিও লোম নেই, তার ওপরে ঘা। চব্বিশ ঘণ্টা মাছি বসে থাকে। সবাই দূরছাই করতে লাগল। বাবা বললেন, তোর কি আক্কেল, পছন্দ বলে কিছু নেই! ফেলে দিয়ে আয় ডাস্টবিনে। অনি কিন্তু এতে একটুও ঘাবড়ে যায় নি। বরং জেদই বেড়ে গেছে। ওর কাছে কুকুরটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ। তা তিন মাসের প্রবল যত্নে ও তীব্র ইচ্ছা-শক্তিতে অনি সাকসেসফুল হল। পুলিসকে আর চেনাই যায় না। দিব্যি নাদুসনুদুস। সারা গায়ে ঘন লোম। মুখে আলগা শ্রী। বাড়িতে এখন একটা কাকও বসতে পারে না। আর অসাধারণ আই কিউ।

তন্দুপুকুর রোডে হাবুলের অনেক দিনের একটা ছোট চায়ের দোকান আছে। আলুর দম, ঘুগনি, ডিমের কারি পাওয়া। বয়মে থাকে কেক,

বিস্কুট, পাঁউরুটি। হাবুলের সঙ্গে পরামর্শ করে অনি ঠিক করল ব্যাপারটা হাতেনাতে ধরতে হবে। দোকানের সামনেই ওর বন্ধু তপুদের বাড়ি অনি একদিন সেখানে লুকিয়ে রইল। বেলা তখন দশটা। প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর দেখা গেল ছুটতে ছুটতে পুলিস আসছে। তারপর হাবুলের দোকানের সামনে মুখ থেকে গোটাকয়েক খুচরা পয়সা ফেলে দিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। অনি তো তাজ্জব। পয়সা চুরি করে খাবার খাওয়া হচ্ছে। পেটে পেটে এত বুদ্ধি! হাবুল প্লেটে ঘুগনি আর তু'পিস পাউরুটি বেড়ে দিল। আরে, এ যে মানুষের মতো আদব-কায়দা! হাবুল বলে, আমি যদি খাবার না দিই তো আমার পাজামা কামড়ে ধরে। কি বড় বড় দাঁত খোকাবাবু! আমার ভয় লাগে।

এ তো গেল খাবার খাওয়া। এবার পয়সাচুরির কায়দাও ধরে ফেলতে হবে। একদিন মার ঘরে আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে মড়ার মতো শুয়ে রইল অনি। খাটের নিচে বহুদিনের একটা টিনের বাক্স আছে। তাতে তালা নেই। মা'র হাতখরচের খুচরো পয়সা এখানেই থাকে। বেলা দশটার কিছু পরে পুলিস চোরের মতো ঘরে ঢুকলো। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। ঘরে আর কেউ নেই। তা সময়টা বেশ ভালই বেছেছে। পুলিস ঠেলে ঠেলে বাক্সটাকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেল। তারপর মুখ দিয়ে চেপে ডালাটা খুলে ফেলল। পয়সা নিয়ে বাক্সটাকে আবার আগের জায়গায় রেখেও দিল। কি নিখুঁত কাজ! পাড়ার পাকা চোর হরিও পুলিসের কাছে হার মানবে। আনন্দে ও গর্বে চাদরের তলায় অনির বুকটা ফুলে উঠল। আবার দুঃখও হল একটু। আহারে. এই বুদ্ধিটা যদি সৎপথে যেত, তা হলে দেশের কত উপকারে লাগত।

অনির পরম বন্ধু সেজকাকা। রাত্রে বাড়ি ফিরলে অনি গম্ভীরমুখে পরামর্শ করতে বসল।

—জান সেজকাকা, আমাদের পুলিস আর যে পুলিস নেই।

—কেন রে, কি হল ?

অনি তখন যা যা দেখেছিল, সব বলে শেষে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা যদি ওকে বেলগাছিয়ার ভেটিরিনারি কলেজে নিয়ে যাই ?

সেজকাকা বলল, কিছু হবে না। ভেটিরিনারি কলেজে শুধু চিকিৎসা হয়। পুলিসের চরিত্র-সংশোধন তোমাকেই করতে হবে।

—সেটা কিভাবে ?

—তা তুমিই জান ! যেভাবে নেড়িকুত্তার গায়ে লোম গজিয়েছ, ঠিক সেই ভাবে।

এখন এটাও অনির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ও এতে ভয় পায় না। তক্ষুণি চিন্তা করতে বসে গেল। পুলিসের আই কিউ আছে আর তার মনিবের থাকবে না, এ কখনো হয় ? উপায়ও একটা হয়ে গেল। অনি ইলেকট্রিকের কাজ কিছু কিছু জানে। সেজকাকার সঙ্গে সঙ্গে থেকে শিখে নিয়েছে। আর এটা যখন বিজ্ঞানের যুগ তখন বিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়াই তো সবচেয়ে ভাল। পরদিন সাড়ে ন'টার সময় অনি বাক্সের সঙ্গে ইলেকট্রিকের তার দিয়ে সুইচে কানেকসন ক'রে দিল। ডি. সি. কারেন্ট। সোয়া দশটা, দশটা বাইশ, দশটা সাতান্ন—গুনে গুনে এই তিনবার শক্ খেয়ে বেচারা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। চাদরের তলায় অনির সে কি হাসি ! ব্যস হাতে হাতে ফল—চিরতরে চরিত্র-সংশোধন। আর কখনো পুলিস হাবুলের দোকানে খাবার খেতে যায় নি।

সত্যি, সরষের মধ্যে ভূত থাকলে কখনো চলে !

রিং মাষ্টার থেকে জজ

অনির ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানার নবম সদস্য হল পুষি। যেমন ওর শরীরের গড়ন, তেমনি সুন্দর মুখশ্রী। আর সারা গায়ে এমন ডোরা কাটা কাটা দাগ আছে যে, দেখলেই মনে হবে বুঝি সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার। অনি প্রথম যেদিন পুষিকে দেখল, সেই দিনই বিপদে পড়ে গেল অর্থাৎ ভালবেসে ফেলল। না হলে পাড়ায় তো আরও কত বিড়াল আছে; বেঁটে, লম্বা, কালো, সাদা, গোঁফওয়ালা, গোঁফহীন—কত রকমের চাই। অনি তাদের দিকে ফিরেও তাকায় নি এত দিন। আসলে অনিদের পাড়ায় বিড়ালের সংখ্যা এমনিতেই বেশী। মাঝে মাঝেই কে বা কারা একটা বস্তায় বিড়ালের বাচ্চা বেঁধে পাড়ায় ছেড়ে দিয়ে যায়। যেন এটা বিড়ালদের একটা অভয়ারণ্য। নতুনের প্রতি অনির বরাবরের ঝোঁক থাকার জন্যেই এত দিন একটা বিড়ালও পছন্দ হয় নি। অথচ চিড়িয়াখানায় একটা বিড়াল চাই-ই চাই। কাকা বলেছে, বাঘের বিকল্পে একটা বিড়াল অন্ততঃ না থাকলে লোকে চিড়িয়াখানা বলে মানবে কেন? দেখিস, বড়দিনের ছুটিতে মুনমুন, পগা কাতলু, ঝমা সবাই আলিপুরে গিয়ে ভিড় করবে।

অনি ভেবে দেখল, কথাটা ঠিক। সেই দিন থেকে নতুন উৎসাহে নতুন বিড়াল খুঁজতে লেগে গেল। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে এই চমৎকার বিড়ালটার সন্ধান পেল। কিন্তু পেলে হবে কি, বিড়ালটা মহাধুরন্ধর; অনিকে কিছুতেই পাত্তা দেয় না। হয়ত এই দেখা গেল সরকার বাড়ির কার্নিসে, তার পরেই আর সেখানে নেই। চলে গেছে বাপ্পাদের ভাঁড়ার ঘরে। এর একটু পরেই হয়ত মা চেঁচিয়ে উঠল, ছাখ তো অনি, রান্নাঘরে ঘুটুর ঘুটুর কিসের শব্দ?

অনি অমনি দৌড়ে গিয়ে দেখে এক বাটি দুধ শেষ করে বিড়ালটা পাঁচিলের ওপর উঠে গোঁফে তা দিচ্ছে। অনি রেগে গিয়ে চড় দেখাল।

কি আশ্চর্য, বিড়ালটাও তক্ষুণি একটা হাত তুলে ধরল চড়ের ভঙ্গীতে। অনি লাথি দেখাল। বিড়ালও পিছনের পা-টা বাতাসে ছুড়ে দিল। অনি প্রতিজ্ঞা করল, হুঁ, এই বিড়ালই আমার চাই। ঠিক বাঘের মত দেখতে। বনের তাজা বাঘ ধরে পোষ মানানোই হল আসল বাহাদুরি। যে বিড়াল একটু খাবারের লোভে পায়ের কাছে এসে মিঁউ মিঁউ করে, তাদের পুষে কি লাভ!

রাত্রে কাকা অফিস থেকে ফিরলে অনি ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করে। কাকা মুগ্ধ হয়ে বলে, ভারী মজার তো, লাথি দেখালে লাথি, চড় দেখালে চড়। তাহলে এই বিড়ালটাই ধর।

মাও বিরক্ত হয়ে গেছে। রান্নাঘরে দুধ, মাছ রেখে একটু এদিক-সেদিক করার উপায় নেই। চোখের নিমেষে ফরসা। তার ওপরে বিড়ালটা আবার মিষ্টি খাবার যম। এই সেদিন রেশনে পাওয়া পুরো চিনিটা চেটেপুটে শেষ করেছে। সুতরাং ঠাকুরপোর পরামর্শে মা খুশী হয়। বলে, একেই নেংটি ইঁদুরের জ্বালায় জ্বলছি, তার ওপর সুগ্রীব দোসের জুটেছে রং-মাখা বিড়ালটা। মরণ –

কিন্তু অনি কিছুতেই কায়দা করতে পারে না। বিড়ালটা দেখতে দেখতে উধাও হয়। সারা পাড়া জুড়ে ওর অবাধ গতি। এই আছে এই নেই। অনি তো বটেই অনির যাবতীয় বন্ধুরাও হিমশিম খেয়ে যায়।

অবশেষে একদিন হেঁটে হেঁটে সুযোগ এল। ব্যাপারটা প্রথমে টের পায় তপু। সে-ই ডেকে নিয়ে আসে অনিকে।

অনিদের বাড়ির সামনে রাস্তা খুঁড়ে সি. এম. ডি. এ. নর্দমার জন্য বিশাল বিশাল পাইপ বসাচ্ছে। বেচারা তার মধ্যে পড়ে গিয়ে কুঁই কুঁই করছে। রাত্রিবেলা তপু ধীরেন স্যারের কাছ থেকে অঙ্ক শিখে সেই সময় বাড়ি ফিরছিল। অনি এসে চাঁদের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল, হ্যাঁ, এই সেই পাজী বিড়াল। বাছাধন আচ্ছা জব্দ! কিছুতেই উঠতে পারছে না। অনি চড় দেখাল। বিড়ালটা হাত তুলল না।

অনি লাথি দেখাল। বিড়ালটা করুণ চোখে কাকুতি জানাল, মিঁউ মিঁউ। অর্থাৎ বিপদে পড়ে একেবারে সিধে হয়ে গেছে। যেন তরাইয়ের সবচেয়ে গুণ্ডা হাতিটা কাদায় পড়েছে।

এখন কিভাবে উদ্ধার করা যায় সেটাই সমস্যা। পাইপের মধ্যে নামা যায় অবশ্য, তবে নামলে আর ওঠা যাবে না। ক'দিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় ওখানে জল জমে গেছে। সেই জলের মধ্যে একটা ইটের দ্বীপে বিড়ালটা কোন রকমে বসে আছে। আর মাঝে মাঝে অনির দিকে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ বাঁচাও, বাঁচাও। কেউ বিপদে পড়লে অনির বুদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি খুলে যায়। তক্ষুণি বাড়ি থেকে একটা ঝুড়ি ও দড়ি নিয়ে এল। তারপর ঝুড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে সি. এম. ডি এ-র বিরাট কপিকলের সাহায্যে সেটাকে নামিয়ে দিল নীচে। অনি ভেবেছিল, বিড়ালটা বুঝি উদ্ধারের কৌশলটা ঠিকমত বুঝতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল বিপদে যেমন অনির বুদ্ধি খুলে যায়, তেমনি বিড়ালটারও বুদ্ধি খুলে যায়। ঝুড়িটা সামনে যেতেই বিড়ালটা চট্ করে তাতে চড়ে বসল।

কাকা সেই সময় অফিস থেকে ফিরে জামা খুলছিল। অনি বাঘ রঙের বিড়াল কোলে হাঁফাতে হাঁফাতে সামনে গিয়ে উপস্থিত। এই না দেখে কাকার মুখে কথাটি নেই। পাকা তিন মিনিট লাগল কথা যোগাতে।

—দেখে নিও বৌদি, অনি বড় হলে রিং-মাস্টার হবে।

- রিং-মাস্টার হয়ে কাজ নেই বাপু। বিড়ালটা এখন ইঁদুর মারলে বাঁচি। মা রান্নাঘর থেকে কথাগুলি ছুড়ে দিল।

—তা ভালই মারবে। এটা একটা নটোরিয়াস বিড়াল, প্রায় বাঘের কাছাকাছি।

এদিকে বিড়ালটাকে উদ্ধারকারীর প্রতি অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ হতে দেখা গেল। অনির কোলে শান্তশিষ্ট ভঙ্গীতে বসে আছে যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। অনি গালের সঙ্গে ঠেকাল ওর মুখ। বিড়ালটা অমনি গলে গেল, মিঁউ মিঁউ।

কাকা বলল, খুব ভাল জাতের বিড়াল রে। যত্নে রাখবি। তোর চিড়িয়াখানার শো বাড়বে

অনি বারান্দার এক কোণে প্যাকিং বাক্স পেতে তার মধ্যে একটা বস্তা বিছিয়ে দিল। বিড়ালটাকে বলতেও হল না। এক লাফে সেখানে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। পাইপে পড়ে গিয়ে বেচারার ভারী কষ্ট হয়েছে। তার আগে অবশ্য এক বাটি দুধ চুকচুক শব্দে ফিনিস হল।

অনি বলল, মা, আজকের রাতটা ওকে রেস্ট দাও। কাল সকাল থেকে ইঁদুর মারতে শুরু করবে।

দিন কয়েক সমানে ওর ওপর নজর রেখে রেখে অনি আবিষ্কার করল, বিড়ালটা মিষ্টির বেজায় ভক্ত। দুধের মধ্যে এক থাবা চিনি না ফেললে খেতে চায় না। ভাল জাতের মিষ্টি, যেমন রসগোল্লা-সন্দেশ পেলে তো কথাই নেই। তবে মাছের তেমন ভক্ত নয়। তা ভালই হয়েছে। মাছের যা দাম! অনিদের বাড়িতে সপ্তাহে দুদিন নিরামিষ হয়।

কিন্তু আসল কাজের বেলায় দেখা গেল ঢু-ঢু। অর্থাৎ বাড়িময় ইঁদুরের উৎপাত বেড়েই চলেছে। মা বলে, কিরে অনি, তোর বাবু বিড়ালটা তো একদম অপদার্থ। শুধু চেহারার চেকনাই আছে। অমন বিড়ালে আমার কাজ নেই। দূর করে দে।

অনির একমাত্র ষ্টং সাপোর্টার কাকাও যেন বিড়ালের স্বভাবচরিত্র দেখে ঘাবড়ে যায়। বলে, যে-রকম ভাবা গিয়েছিল, তা তো নয়। বাঘের মত দেখতে, কিন্তু বাঘের মত তেজ কই? রাত-দিন প্যাকিং বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকে। এ কি রকম বিড়াল!

মনে মনে অনিও যে চিন্তিত হয় নি তা নয়। তবু কোন ব্যাপারে বিনা চেষ্টায় হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ও নয়। বলল, আমাকে তোমরা দশ দিন সময় দাও। দেখি কি হয়।

আশ্চর্য মাত্র দশ দিন পরেই অসম্ভব সম্ভব হতে দেখা গেল। যেন বিড়ালের গায়ে অনি মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ইঁদুরেরাও বুঝে

গেল আর সুদিন নেই, ঘরে সাক্ষাৎ যম এসেছে। বিড়ালটা বিশ্রাম কাকে বলে জানে না। কেবলই তিড়িং-বিড়িং করে লাফ দেয় আর ইঁদুর ধরে। দিনকয়েকের মধ্যেই ভাঁড়ারে বর্গীর হাঙ্গামা একেবারে স্তব্ধ।

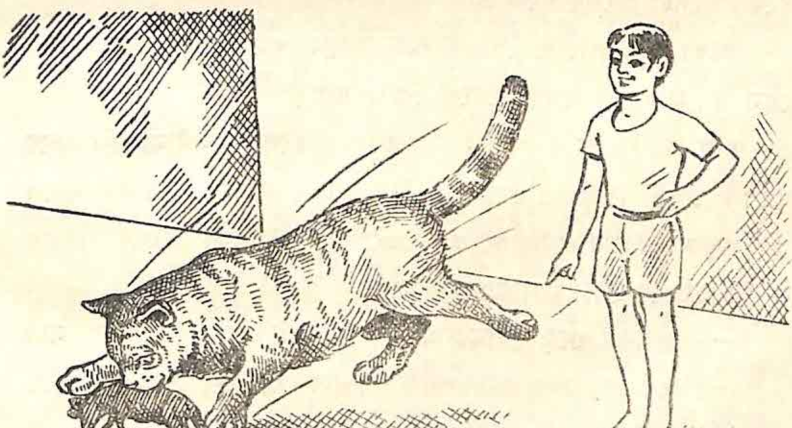
মা অবাক্ হয়ে বলে, এ কেমন করে হল রে অনি! তুই ম্যাজিক জানিস নাকি?

কাকার মন্তব্য, মাত্র দশ দিনেই স্বভাব পালটানো তো সোজা কথা নয়! রহস্যটা খুলে বল তো অনি।

অনির মুখে হাসি আর ধরে না। বলল, আমি একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলাম কাকা। তাতে শতকরা একশো ভাগই সাকসেসফুল হয়েছি।

—কি রকম?

—এই ধর, মিষ্টি খাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়ে সে জায়গায় নুনের পরিমাণ বাড়াতে লাগলাম। অনি হাত নেড়ে কাকাকে বোঝাতে বসে:



প্রথম প্রথম কিছুতেই নুন খাবে না বা মিষ্টি ছাড়বে না। দুদিন তো স্রেফ উপোষ করেই রইল। তারপর দুধের মধ্যে এক খাবলা নুন ফেলে দিলাম। দেখি খিদের জ্বালায় সেটা খেয়ে নিল।

—তাতে কি হল ?—কাকা তো অবাক্।

—বুঝলে না, সুন্দরবনের বাঘেরা অত হিংস্র কেন, নোনা জল খেয়েই তো সেইজন্য সরকার সেখানে সাতটি মিষ্টি জলের পুকুর কেটে দিচ্ছে, যাতে সেই জল খেয়ে বাঘেদের হিংসাভাব দূর হয়। তা পুষির তো হিংসাভাব দূর করবার দরকার নেই, তাই ওর উল্টো ব্যবস্থা। দেখ, ইঁদুরেরা কেমন নিপাত যাচ্ছে।

সত্যি এ যে বিস্ময়ের পর বিস্ময়! ওইটুকু মাথার মধ্যে এত বুদ্ধি! খবরের কাগজে সুন্দরবনের গভীরে পুকুর কাটার খবর সবাই পড়েছে। কিন্তু সেটা ঘরের বিড়ালের ওপর নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে কজনে পারে? কাকা মুগ্ধ।

অনি একটু চিন্তা করে বলে, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কাকা। সেটা হল, জেলখানার খুনী-ডাকাতদের যদি এখন থেকে সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়ানো যায়, তাহলে নিশ্চয় ওদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। সেটা দেশের পক্ষে ভাল নয় কি?

কাকা বলে, তাহলে তো আমিই মানুষ খুন করে জেলে যাব। কেন না, সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে কে না চায়!

তাই তো! অনি আবার ভাবে। তাহলে জেলখানাগুলি ভরে যাবে। একটু পরেই লাফিয়ে ওঠে, ঠিক আছে, সন্দেশ-রসগোল্লার বদলে চিটেগুড় খাওয়ানো হোক ওদের। এতে দামেও সস্তা পড়বে আবার মিষ্টির প্রভাবে হৃদয়ের পরিবর্তনও হবে।

—কিন্তু চিটে গুড়ে ভয়ানক গন্ধ। গরুরাই বলে খেতে চায় না!

—তাহলে তো ডবল অ্যাকশন। জেলে গিয়ে শুধু চিটে গুড় খেতে হবে, এই ভয়ে অনেকেই তখন খুন জখম ছেড়ে দেবে।

কাকা আনন্দে লাফিয়ে উঠল, বৌদি, আমার কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি, অনি রিং-মাস্টার হবে না।

মা সায়ার লেস বুনতে বুনতে এতক্ষণ খুড়ো-ভাইপোর উচ্চমার্গের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ফিক্ করে হেসে ফেলল, তাহলে কি হবে, হাইকোর্টের জজ?

অনির টিয়াপাখি

গণেশের সঙ্গে অনির ভারী বন্ধুত্ব। দুজনের প্রকৃতি কিন্তু একেবারে আলাদা। গণেশ যেমন খেতে-দেতে ভালবাসে অনি একেবারেই বাসে না। ছোটবেলা থেকেই ওর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আগ্রহ কম। বাবা-মার মনে সেই জন্যে ভারী অশান্তি। না খেলে কি শরীর টেকে? মা বলে অনির বুকের হাড় গোণা যায়! আর গনেশ সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। জীবনে ওর বাসনা-কামনা কি, তা পাড়ার সবাই জানে। প্রতিভা কি কখনো চাপা থাকে? অনির সঙ্গে যে গণেশের গভীর বন্ধুত্ব তা লক্ষ্য করে অনির বাবা-মা খুব খুশি। মনে মনে আশা বন্ধুর প্রভাবে একদিন অনিও খাওয়া শিখবে।

দু'জনের মধ্যে আলাপ হয়েছিল এক বিয়ে বাড়িতে। দু'জনে পাশাপাশি বসেছে। গণেশের কলাপাতা একেবারে পরিষ্কার। খালি একপাশে নুন, তেজপাতা আর মাংসের হাড় পড়ে আছে। আর অনির পাতে দুটো রসগোল্লা, দুটো লেডিকিনি, একটা সন্দেশ তখনও গড়াগড়ি খাচ্ছে। গণেশ বলল, খোকা ওগুলো খেয়ে ফেল। জানো না, দেশের প্রধানমন্ত্রী খাদ্য অপচয় করতে বারণ করেছেন?

অনি কাতর কণ্ঠে বলল, আমি চাইনি তবু দিয়ে গেছে।

—তা তো দেবেই, না হলে আর বিয়ে বাড়ি কিসের!—গণেশ মুরব্বী চালে বলল, তোমাকে একটি ট্রিক বলে দিই। বিয়ে বাড়িতে যখন দেখবে আর খেতে পারছ না, তখন একটু লেবু খেয়ে নেবে। দেখবে মুখ খুলে যাবে আবার মুখ বন্ধ করার কায়দাও আমার জানা আছে। কিন্তু তার আর কি দরকার!

অনি পরামর্শ মত লেবু মুখে দিল, কিন্তু তবু একটা সন্দেশও খেতে পারল না। আসলে ওর স্পৃহাই কম। তখন গণেশকে এগিয়ে আসতেই হল। না এসে উপায় কি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সমান্য একটা

অনুরোধও রাখতে পারবে না? দুটো রসগোল্লা, একটা সন্দেশ, দুটো লেডিকিনি চোখের পলকে অদৃশ্য করে একটু জল খেয়ে গণেশ বলল, তোমার নামটি কি ভাই?

—অনি, ভাল নাম অনিন্দ্য।

—বেশ বেশ। গণেশ সজোরে ঢেকুর তুলে বলল, সাধে কি প্রধানমন্ত্রী খাদ্য অপচয় করতে বারণ করেছেন? ফি বছরে ভারতের প্রচুর পরিমানে খাদ্য বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। এতে লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যায়। এবার কত টন গম লাগবে সে সম্পর্কে কোন আইডিয়া আছে?

বিস্মিত অনি মাথা নাড়ল, না কোন আইডিয়াই নেই।

গণেশের ঠোঁট দুটো নড়াচড়া করল, অর্থাৎ চিন্তা করছে। তারপর বলল, নাঃ ঠিক এখনই মনে পড়ছে না কত টন। আমার নোটবুকে লেখা আছে। অনির তখন কথা বন্ধ হয়ে দুটো চোখই বড় হতে আরম্ভ করেছে। এইমাত্র যে রসগোল্লা সন্দেশগুলি ভ্যানিশ করে দিল সে তো এলেবেলে ছেলে নয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা—সব জানে। মায় ফি বছর ভারতের কত টন গম লাগে—তাও নাকি নোট বুকে টোকা আছে।

এই থেকে বন্ধুত্বের শুরু। তারপর আরও ঘন হল গণেশের বাবা যখন চেতলা ছেড়ে ঢাকুরিয়ায় বাস করতে এলেন। আজকাল বাসের বড় গণ্ডগোল। গণেশের বাবা মুকুন্দবাবুর অফিস শিয়ালদহের কাছে। ট্রেনে করে শিয়ালদয় এসে অফিসে হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

সুতরাং বন্ধুত্ব এবার জমে উঠেছে। গণেশদের বাসা ঢাকুরিয়ার শেষ দিকে আর অনিদের হালতুর শুরুতে। আজ দুপুরে গণেশ অনিদের বাড়িতে এল। অনি তখন ওর টিয়াপাখিটাকে নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিল পড়াশুনা ছাড়া অনির বাকী সময়টা পশুপাখির পরিচর্যাতেই কাটে। অনির ঘরটাকে ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও

বলা যায়। কি নেই সেখনে? কুকুর, বিড়াল, খরগোস, টিয়াপাখি, বদরিপাখি, ময়না, পায়রা, কাকাতুয়া মায় কাক পর্যন্ত। ওদের জন্যে বাজার থেকে ফল আসে। অঙ্কুরিত ছোলা, খুঁদ, কাঁচা লঙ্কা—সব মজুত থাকে। অনির ছোট কাকা বিলেত থেকে ছোট একটা ওজন করার যন্ত্র পাঠিয়েছে। অনি প্রতি মাসে ওদের ওজন নিয়ে দেখে স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে। পশুপাখির ডাক্তার থাকেন বেলগাছিয়ায়। অত দূরে যেতে পারে না। তবে চিকিৎসাপত্তর অনি নিজেই চালায়। কয়েকটি বদরি পাখির মৃত্যু ছাড়া তাতে ফল ভাল বই মন্দ হয়নি। অনির চিড়িয়াখানার প্রত্যেকটি সদস্যই সুস্থ আর সতেজ। বাড়িতে কেউ এলে কুকুর যেমন ঘেউ ঘেউ করে, মিনি তেমন করে মিঁউ মিঁউ। ময়না চমৎকার গলায় ডাকে, কে তুই কে তুই। টিয়াপাখিটা বলে ওঠে, বসতে দে বসতে দে। কাকাতুয়া বলে চা কর খাবার আন। এসব কি আর অমনি অমনি হয়েছে! এর পেছনে অনির একাগ্র সাধনা আর পরিশ্রমের কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সেই অনি আজ একটু মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। গত মাসে টিয়াপাখির ওজন ছিল দুশো গ্রাম, এমাসে হয়ে গেছে আড়াইশো গ্রাম। তার আগে ছিল দেড়শো। আজকাল সব সময় ঝিম মেরে পড়ে থাকে। আগের মত কথাবার্তা শিখতে চায় না। মুখে এক বুলি, ভাল লাগে না, ভাল লাগে না—।

গণেশ সব শুনে এক মুঠো অঙ্কুরিত ছোলা মুখে ফেলে বলে, খাওয়া কমা খাওয়া কমা, দেখছিস না মোটা হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে আমার পিসিমার মত অবস্থা হবে।

অনি চিন্তিত হয়ে বলে, তোর পিসিমা বুঝি খুব মোটা?

—উরেব বাবা, মনে হবে যেন একটা কলসি। চোখ দেখা যায় না। খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার বলেছে সকাল বিকেল খোলা জায়গায় বেড়াতে।

অনি যেন একটু হদিশ পেল, ঠিক আছে, আজ থেকে ওর বরাদ্দ একটা পাকা লঙ্কা আর গোটা দশেক ছোলা।

—কিন্তু সকাল বিকেল খোলা জায়গায় বেড়াতে হবে যে। পাখিটা তো রাতদিন ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। এতে কারও শরীর ভাল হয়?

—চল তাহলে এখনি বেড়িয়ে আনি। অনি খুব খুশি হয়ে বলল: বাইরে চমৎকার বিকেল নেমেছে।

খাঁচাখানা দোলাতে দোলাতে অনি আর গণেশ রাস্তায় নেমে এল। কোথায় যাওয়া যায়? হাঁটতে হাঁটতে ঢাকুরিয়া স্টেশন এসে গেল। কলকাতা শহরে ফাঁকা জায়গা পাওয়াই দায়। অনি জিজ্ঞাসা করল, এখন কোন ট্রেন আছে নাকি?

গণেশ বলল, বোধহয় আছে দেখছিস না লেভেল ক্রশিং পড়ছে।

অনির তখন পগার কথা মনে পড়ল। পগা সোনারপুর থেকে রোজ ট্রেনে করে আসে। ওদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ে। পগার মুখে খালি সোনারপুরের গল্প। সোনারপুর স্টেশনের গায়েই নাকি মস্ত বড় দীঘি। দীঘির কিনার দিয়ে পিচের রাস্তা। একটু এগোলেই ফাঁকা মাঠ। মাঠ জুড়ে সবুজ ধানের শিষ। তার ওপর বাতাস দিবারাত্র দোল খায়। দুপুর বেলায় আকাশটা নীলবর্ণ হয়ে ধান ক্ষেতে আরও ঝুঁকে পড়ে—এইসব। বালিগঞ্জ থেকে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াতেই অনি আর গণেশ তাতে চড়ে বসল। বেশ ভিড় ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে বাজখাই গলার আওয়াজ হল টিকিট? তাকিয়ে দেখে ইয়া মোটা ভুড়িদার একটা লোক গায়ে কালো কোট, মুখে এক জোড়া গোঁফ। গণেশ ভয়ে ভয়ে দু'খানা টিকিট বের করে দিল।

—পাখিটার টিকিট?

— টিয়াপাখির আবার টিকিট লাগে নাকি?

দুজনেই অবাক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ছোকরা, কুকুর বিড়াল ছাগল পাখি—সবার টিকিট লাগে। কই বের কর টিকিট!

অনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, তা তো জানি না। পাখিটাকে একটু খোলা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলাম।

গণেশ এগিয়ে এল, পাখিটা বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছে। তাই স্লিম করার জন্যে—

সরু মোটার তুমি কি বোঝ হে ছোকরা? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি—এই বলে তিনি খাঁচাটাকে কেড়ে নিতে গেলেন। গণেশ আর অনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। টানাটানির চোটে খাঁচার দরজা আলগা হয়ে যেতেই টিয়াপাখিটা উড়াল দিয়ে মাঠের একটা কদম গাছের ডালে বসল। হায় হায় করে উঠল অনি, কামরা ভরে হো হো হাসি। চেকার মশাই হতভম্ব। গণেশ বলল, ব্যস পাখি পলাতক। ধরুন এবার আমাদের!

চেকারের হাত থেকে রক্ষা পেলেও অনির মনটা খারাপ হয়ে গেল। পাখিটাকে কতদিন ধরে মানুষ করেছে। কত কথা শিখেছে। সোনারপুরে নেমে খানিকক্ষণ ওরা পাখিটাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা



করল। তারপর ফিরতি ট্রেনে ফিরে এল। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পরিচিত সরু গলায় কে যেন বলে উঠল, বসতে দে বসতে দে। তাকিয়ে দেখে কার্নিশে টিয়াপাখিটা মনের আনন্দে লেজ দোলাচ্ছে। অনি আর গণেশ খাঁচা হাতে দৌড়ে গেল।



গণেশচন্দর

গণেশ এক নম্বরের পেটুক। খাবার পেলে আর কথা নেই। খেয়েদেয়ে পেটটি হয়েছে ঠিক গণেশ ঠাকুরের মতই। বাড়িতে ওর ভাগে আবার একটু বেশিই পড়ে থাকে। মা বলেন, আহা, গণশার বুকের হাড় ক'খানা গোণা যায়, খাক একটু। শীলা, লীলা, রবি ওরা সব হৈ-হৈ করে ওঠে। বলে, তুমি খালি দাদাকেই বেশি বেশি দাও, আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি! মা কিন্তু সে কথায় কান দেন না।

গণেশ ইস্কুলে টিফিন নিয়ে যায়। সুনীলবাবু সুন্দর করে কবিতা পড়ান, অনিলবাবু বোর্ডে অঙ্ক শেখান—কিন্তু গণেশের মন পড়ে থাকে টিফিন কৌটোটার দিকে। মাঝে মাঝে মাস্টার মশাইদের চোখ এড়িয়ে টিফিন কৌটোটা খুলে দেখে—সব ঠিক জায়গায় আছে কি-না। টিফিনের ঘণ্টা যেন পড়তেই চায় না।

গায়ে জোর থাকায় গণেশকে ক্লাসের সবাই ভয় করে। নিজের খাওয়া হয়ে গেলে অন্যদের দিকে নজর দেয়।

—এ্যাই ভোলা, আজ কি এনেছিস রে?

ভোলা ভয়ে ভায় বলে, মুড়কি। এই নাও—

গণেশ এক মুঠো নিয়ে পাশের ছেলেটার দিকে তাকায়, তুই কি এনেছিস পটলা?

পটল টিফিন বাকস্‌টা খুলে ধরে। চার পিস মাখন রুটি আর সন্দেশ। এক পিস মাখন রুটি এবং সন্দেশের খানিকটা মুখে দিতেই গণেশের চোখ বুজে আসে। বলে, ফাস কেলাস।

শ্রীমান পটল এই প্রশংসায় ধন্য হয়ে যায়।

গণেশ এইভাবে রোজ অন্যেরটা খায়। কেউ এর জন্যে অবশ্য রাগ করে না, মাস্টারমশাইদের কাছে বলেও দেয় না। কেননা, গণেশদা তাহলে খেলতে নেবে না।

গণেশের সঙ্গে হাবুলের দারুণ বন্ধুত্ব। হাবুলের দিদির বিয়ে হবে কুচবিহারে। সবাই সেখানে যাবে। হাবুল বলে বসল, তুই-ও সঙ্গে চ'; জোর বেড়াব দু'জনে। বেড়াবার চাইতে খাওয়ার সুবিধে হবে ভেবে গণেশ উৎসাহিত হল। বাড়ি এসে মাকে ধরল, এখন তো গরমের ছুটি, পরীক্ষাও হয়ে গেছে, আমি যাব। শেষে অতি কষ্টে মায়ের সুপারিশে বাবার কাছ থেকে কুচবিহার যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। হাবুলের বাবা খুব ভাল মানুষ। প্রতি ষ্টেশনে যখন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বাবা গণেশ আর কি খাবে?—তখন গণেশের ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কুচবিহারে যে হাবুলের এক ডাকসাইটে পিসিমা থাকেন, সে কে জানত। পয়লা রাতেই মন্তব্য করলেন, এ ছেলেটা কে রে? খায় তো দারুণ।

কুচবিহারে নেমন্তন্নে দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া হয়। দুপুর বারোটায় প্রথম ব্যাচ বসল। ইতিমধ্যে গণেশ রান্নার জায়গায় গিয়ে খবর নিয়েছে কি কি হচ্ছে। দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন। মাছ, মাংস, পোলাও। মাথা দিয়ে মুগের ডাল, ডিমের ডেভিল। এর যে কোনটার জন্যে ও বুঝি পাগল হয়ে যেতে পারে। বাতাসে চমৎকার সুগন্ধ! তাড়াতাড়ি স্নান সেরে জামা কাপড় পরে গণেশ সেই সকাল সাতটাতেই রেডি হয়ে বসে আছে। ভোরে উঠে শুধু চা আর দু'খানা বিস্কুট খেয়েছে। সবাই দই চিঁড়ে খেলেও গণেশ খায় নি। দই চিঁড়েতে পেট ভার হয়। বেশি টানতে পারবে না। ফলে বেলা একটু

বাড়তেই পেট চিঁচি করে ডাকতে লাগল গণেশের। কোন দিক থেকে পরিবেশন শুরু হতে পারে এই ভেবে একটা জুতসই জায়গায় বসে পড়তেই কোথা থেকে হাজির হল হাবুলের পিসিমা। আরে তুমি তো ঘরের ছেলে, তুমি এখন বসছ কেন? আগে বাইরের লোকরা বসুক—।

গণেশ আর কি করে! খুব অনিচ্ছায় উঠে পড়ে। তবে একটু আনন্দও হল, হাবুলের ডাকসাইটে পিসিমা ওকে ঘরের ছেলে ভেবেছে দ্বিতীয় ব্যাচ বসল সেই দুটোয়। গণেশ তখন সর্ষেফুল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ভিড়ের ভিতর এমন জায়গা বেছে নিল যাতে হাবুলের পিসিমার নজরে না পড়ে। হা কপাল!! পাতে সবে গরম পোলাও পড়েছে, এমন সময় মাটি ফুঁড়ে যেন পিসিমার আবির্ভাব ঘটল, আরে তুমি তো বেশ। কতদূর থেকে লোক এসেছে, এদিকে তুমি ঘরের ছেলে হয়ে আগেই বসে পড়েছ। লোকে কি বলবে।

ঘরের ছেলে ও অন্যান্যদের জন্যে শেষ ব্যাচ বসল আরও দু'ঘণ্টা পরে। অর্থাৎ বিকেল চারটের। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।



গণেশের ভাগ্যে জুটল ছেঁড়া কলাপাতা। নিজেকে সান্ত্বনা দিল পোলাও খাবে, না কলাপাতা খাবে! কিন্তু পাতে পোলাও-এর বদলে সাদা

ভাত পড়তে দেখে কান্না পেল। ব্যপার কি ! না, হাঁড়ি খালি। একজন পরিবেশনকারী কপালে ঘাম মুছে বলছে, আগের দুটো ব্যাচ যা খেল। বেগুন ভাজা ছাড়া কিছু নেই। গণেশের পাতে পড়ল তিনটে আলু আর মাংসের খানিকটা ঝোল। রান্নার জায়গা থেকে ঠাকুর দৌড়ে এসে হুঁশিয়ারি দিল একটু আস্তে খান বাবুরা, মুসুরি ডাল চাপিয়েছি।

হঠাৎ সোরগোল উঠল। গণেশ কাঁদছে। সবাই ছুটে এল সেখানে। হাবুল, হাবুলের বাবা মা, এমনকি হাবুলের পিসিমা পর্যন্ত। সবাই বলছে কি হয়েছে, কাঁদছ কেন গণেশ ? আর একটা আলু দেব ? ওরে দ্যাখতো, ভাঁড়ারে কিছু মিষ্টি আছে কিনা !

কিন্তু গণেশের কান্না কিছুতেই থামে না। এক সময় পিসিমার দিকে জোড়হাত করে বলতে লাগল, দোহাই পিসিমা, আপনি আমাকে আর ঘরের ছেলে ভাববেন না। আপনার পায়ে পড়ি। পরের ছেলে হলে অনেক সুখ। আমাকে—

কান্নায় বাকী কথাগুলো শোনাই গেল না।

আবার জব্দ

পেটুক গণেশকে মনে আছে তো? সেই যে কুচবিহারে গিয়ে হাবুলের পিসিমার কাছে আচ্ছা জব্দ হয়েছিল! আবারও এই সেদিন গণেশ জব্দ হল ওর কাকীমার কাছে। এবার অবশ্য সেজন্য কুচবিহারে যাওয়ার দরকার হল না। বাড়ির কাছেই জব্দ হল। গণেশের কাকা একজন বড় ডাক্তার। রাতদিন বুকে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে রুগী দেখে বেড়ান। কালীঘাটে বাড়ি। অবস্থা খুবই ভাল। কাকার মন-মেজাজও খুব ভাল। কিন্তু কাকীমা ভীষণ কৃপণ। বাড়িতে কেউ গেলে এক কাপ চা দিতেও বুক ফেটে যায়। কখন কে কোন দিক দিয়ে খরচ করে বসবে এই ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকেন। একদিন গণেশ রবি শীলা লীলার সামনে প্রতিজ্ঞা করে বসল, এ্যাই আমি যদি কাকীমার কাছে খাওয়া আদায় করতে পারি, কি দিবি বল?

—ইস, তুমি খেতেই পারবে না।

—যদি পারি?

রবি বলল, তাহলে আমার সব কটা গুলি তোমায় দিয়ে দেব।

লীলা বলল, আমার লাল পেন্সিলটা তোকে দেব।

শীলা বলল, আমি বাবা গরীব মানুষ, একটা চকোলেট দিতে পারি শুধু।

গণেশ বাঁকা হেসে বলল, ইস আমি কত কষ্ট করে কাকীমার কাছে খাব আর তার বদলে কিনা পেন্সিল চকোলেট আর গুলি! ওসব চলবে না। আমাকে গুণে গুণে পাঁচটা রাজভোগ খাওয়াতে হবে। হুঁ—

রবি, শীলা, লীলা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে। পাঁচটা

রাজভোগ কেনার মত পয়সা ওদের নেই। তখন গণেশকেই বুদ্ধি বাতলে দিতে হয়। ঠিক আছে, পয়সায় যদি কম পড়ে তাহলে উজ্জ্বল, পাপিয়া, বুবুলকে সঙ্গে নে। মোটকথা আমার পাঁচটা রাজভোগ চাই-ই। কাকীমার কাছে খাওয়া আদায় করা সোজা কথা নয়!

রবি বলল, কিন্তু যদি খাওয়া আদায় করতে না পার, তাহলে?

—তাহলে আমিই সবাইকে রাজভোগ খাওয়াব।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়ই।

আলোচনা তখনকার মত চাপা পড়ে গেল। পরদিন থেকে গণেশ-চন্দরের কাজে নামার পালা। একথা ঠিক, না খেয়ে বাজি জেতার জন্যে গণেশ কখনো বলবে না, খেয়েছি। পেটুক হলে কি হবে, গণেশ মিথ্যে কথা বলে না। সেটা সবাই জানে।

কাকীমাদের বাড়ি খুব কাছে হেঁটেই যাওয়া যায়। গণেশ সন্ধ্যের সময় গিয়ে খুব অমায়িকভাবে হেসে কাকীমার পায়ের ধূলো নিল, কিছুটা জিভে ঠেকাল।

কাকীমা খুব খুশি হয়ে বললেন, কিরে এতদিন কোথায় ছিলি? তোকে দেখতেই পাই না আজকাল।

গণেশ বলল, ইস্কুলের পর ব্যায়াম করতে যাই, সেইজন্যে সময় পাই না।

—বেশ বেশ। সবার আগে শরীর। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। বোস।

—কাকা কোথায়? কাকাকে প্রণাম করব।

—কাকা কি এই সময় বাড়ি থাকে? রুগী দেখতে গেছে।

গণেশ বসেই আছে। প্রতি মুহূর্তে ভাবছে, এইবার কাকীমা ঘরে ঢুকবে একটা বড় প্লেট নিয়ে। প্লেটে থাকবে রসগোল্লা, সন্দেশ, সিঙ্গাড়া। কাকীমা বলবে, সব শেষ করতে হবে, একটাও ফেললে চলবে না। গণেশের তখন কি মজা! কিন্তু এক ঘন্টা হয়ে গেল তবু

কাকীমা ঘরে ঢুকছে না। কি ব্যাপার? এদিকে খবরের কাগজটা সব পড়া হয়ে গেল। এমনকি, বিজ্ঞাপন গুলোও বাদ দিল না। আর দেরি করা যায় না। ঠিক সময়ে পড়তে না বসলে বাবা রাগ করবে। কি আর করে, গণেশ একসময় বলল, কাকীমা যাই—।

কাকীমা পাশের ঘরেই ছিলেন।

—যাচ্ছিস? তোর তো আবার পড়াশুনা আছে। ইস, একটু যদি আগে আসতিস রে! ফুলকপির সিঙ্গাড়া করেছিলাম। খাওয়ার লোক নেই। শেষে পাশের বাড়ির ছেলেদের ডেকে দিয়ে দিলাম। দেখিস সাবধানে যাস

বাড়ি ফিরতেই রবি, শীলা, লীলা হৈ-হৈ করে উঠল, কি খেলে, কি খেলে?

গণেশ রেগে গেল, চুপ। খাওয়া অতই সোজা! আরও কয়েক দিন যাক।

পরদিন গণেশ আর একটু আগে গেল। কাকা আজ বাড়িতেই ছিলেন। গতকালের প্রক্রিয়ায় পায়ের ধূলো নিল। কাকা খুশি হয়ে বললেন, ওকে কিছু খেতে দাও।

কাকীমা রেগে উঠলেন, বোকা ছেলেকে কিছু দেওয়া উচিত নয়। কেন, আর একটু আগে আসতে পারলি না? ছানা কেটে রসগোল্লা তৈরী করেছিলাম। সব ফুরিয়ে গেল।

কাকা বললেন, তাহলে দোকান থেকে আনিয়ে দাও।

—দোকানের খাবার খাওয়া ভাল নয়। বিশেষ করে যারা ব্যায়াম করে।

পরদিন গণেশ আশায় আশায় কড়া রোদ থাকতেই কাকীমার বাড়ি গিয়ে হাজির হল। ঘড়ি দেখল, সাড়ে তিনটে বাজে। নিশ্চয়ই এত বেলায় বিকেলের খাওয়া শেষ হয়নি। কিছু পড়ে থাকবেই।

কিন্তু কি কপাল তার! সাড়ে তিনটেতেও কাকীমার বকুনি শুনতে হল।

—ভীষণ কুঁড়ে তুই। ভাল জিনিস খেতে হলে রোদের ভয় করলে চলে ? আজ লুচি, কিসমিস দিয়ে মোহনভোগ করেছিলাম। তোর কপালে নেই।

গণেশ তখন অনেক ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করল। কয়েকদিন যাবে না, তারপর একদিন রবিবার দেখে সকালে গিয়ে হাজির হবে। দেখা যাক, তখন কাকীমা কি বলে! খেতে না দিয়ে উপায় থাকবে না।

রবিবার দিন খুব সকালে গণেশ ভাল জামা কাপড় পরে মনে অনেক আশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল। রবি, শীলা, লীলা, উজ্জ্বল, পাপিয়া বারান্দা থেকে তাই দেখল। গণেশদাদার এবার বাজিতে নিশ্চিত হার। ওদের মনেও রাজভোগের আশা জেগেছে।

কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয়! বেচারা ভিতরেও ঢুকতে পারেনি। কাকীমা রাস্তায় দেখতে পেয়েই তিরিক্ষে গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, বোকা ছেলে, কাল আসতে কি হয়েছিল! জানিস না, আজ আমাদের একাদশী ? কাল পোলাউ মাংস হল। কে খায় অত ? শেষে ভিখিরীকে ডেকে দিয়ে দিলাম। তোর কথা খুব মনে হচ্ছিল রে—।

গণেশের একটা গুণ আছে, খাবার-দাবার না পেলে ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। এবং তখন যে সব কথা বলে, দেখা যায় সেগুলি খুবই খাঁটি কথা। যেমন আজকে কেঁদে ফেলে কাকীমার দিকে জোড় হাত করে বলতে লাগল, কাকীমা, তোমার বাড়িতে আমি জীবনেও ঠিক সময়ে আসতে পারব না। আমাকে ক্ষমা কর।

ভোম্বলদা

জোঁকের গায়ে নুন আর চুন দিলে কি অবস্থা হয় দেখেছ তো! জোঁকটা প্রথমে খুব খাবি খাবে তারপর নেতিয়ে পড়বে, শেষে ঠাণ্ডা।

তা চোরের সঙ্গে ভোম্বলদার সম্পর্কটাও ঠিক ওই রকম। ভোম্বলদা একাধারে নুন আর চুন দুই-ই। সোজা কথায় চোরের যম। ভোম্বলদা আসছে শুনলে চোরেরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সোনার পাথর বাটির মতই চোরের চোখের জল ছিল এতদিন অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু ভোম্বলদার কেরামতিতে বহুবার এই দুর্লভ বস্তুটি চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে

ভোম্বলদা বলে পৃথিবীতে চোর শায়েস্তা করার জন্যই আমার জন্মরে। পুলিশ ফুলিশ কিছু না। আসলে চাই টেকনিক। টেকনিকের জোরে চোর সাধু হতে পারে। আর যারা চুরি করার কথা ভাবছে তারাও ওই দেখে সাবধান হবে। অর্থাৎ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন—এই হল আমার ধ্যানজ্ঞান।

আমরা বলি আচ্ছা ভোম্বলদা, এই গুরুতর দায়িত্ব তোমার কাঁধে কে চাপাল?

—কে আবার চাপাবে? যিনি দণ্ড মুণ্ডের কর্তা তিনি।

—অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট।—উজ্জ্বল ফোড়ং কাটল।

—দুস্, গভর্ণমেন্ট? তোদের যেমন বুদ্ধি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। পৃথিবীকে আমি চোরশূন্য করবই। তোরা দেখে নিস।

—পুলিশরা যে বেকার হয়ে পড়বে।—আমরা বলি।

—পড়ুক। ওটা আমার চাকরী নাকি ! পুলিশরা তখন গোলাপ ফুলের চাষ করবে। চারিদিক আমোদিত হবে।

—আর জেলখানা ?

—ওখানে বহুমুখী কাজ হবে। শিশুরা খেলবে, বৃদ্ধরা গীতাপাঠ শুনবে। মহিলারা উল বুনবে। —কত কি !

বলতে বলতে ভোম্বলদার চোখ মুখের চেহারা পাল্টে যায়। এটা শুধু মুখের কথা নয়, ভোম্বলদা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তা ভোম্বল-দার চেহারাখানা দেখবার মত। রাতবিরেতে হঠাৎ দেখলে চোর ডাকাতদের মুর্ছা যাবার চান্স শতকরা একশো ভাগ। পাড়ার মহাশক্তি ব্যায়ামাগারে ভোম্বলদা দুটি বেলা ডন বৈঠক দেয়। একদিনও কামাই নেই। ফলে বর্ষার নতুন জল লাগা লাউডগার মত যেখানকার যত মাংস সব ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এক ঘুসিতে আস্ত নারকোল ফাটায়। মোটা লোহার শিকল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে এ ছাড়া আরও অনেক কিছু পারে।

ভোম্বলদা বলে, লোকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে বেশি খেলে বুঝি স্বাস্থ্য ভাল হয়। মোটেই তা নয়। নিজের ওপর পরীক্ষা করে ভোম্বলদা এর প্রমাণও দিয়েছে।

তা ভোম্বলদার কম খাওয়ার তালিকাটি একবার শুনবে ? ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ। তখনই দুই লিটার দুধ আর আড়াইশো গ্রাম শিস বেরুনো ছোলার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। সকালে এর বেশী কিছু নয়। তারপর এক ঘণ্টা যোগ ব্যায়াম ও ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ। যোগ ব্যায়াম মনে হয় বুঝি খুব সোজা। কিন্তু এতে যথেষ্ট পরিশ্রম। ফলে দারুণ ক্ষিদে লেগে যায় অচিরে। চারটি ডিম সিদ্ধ, হাফ ডজন বড় সাইজের মর্তমান কলা, মাখন টোষ্ট, খান আটেক রাজভোগ ইত্যাদি। দুপুরে সাতশো গ্রাম ভাত, ডাল, তরকারি, রুই মাছের ঝোল, ছোট মাছের ঝাল, চাটনি—এই সব আর কি। দুপুর পশ্চিমে গড়ালেই বড় এক গেলাস হরলিকস, দুটো আপেল আর খান সাত বিস্কুট। বিকালে

দেড় ঘণ্টা জোর এক্সারসাইজ। সারা গা' দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটলে তবেই ক্ষান্তি। এরপর চান সেরে চা সেই সঙ্গে হালকা কিছু। যেমন চিনেবাদামসহ এক জামবাটি চিঁড়ে ভাজা, একখানা গোটা নারকেল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে। রাত্রে নেহাৎ সাদা মাটা আহার। এক দিস্তে আটার রুটি আর স্যালাড। হু, সেই সঙ্গে এক কিলো পাঁঠার মাংস কষিয়ে রান্না করা হয়।

আমরা হাসাহাসি করলে ভোম্বলদা রেগে যায়। বলে, হ্যাঁ, চোর ঠ্যাঙাবার পক্ষে এটাই তো মিনিমাম খাদ্য তালিকা। আমি কি বার্লি খেয়ে ওই কঠিন কাজে হাত দেব ?

ভোম্বলদার ঠাকুমা এই সময় পাশের ঘর থেকে আহ্নিক করতে করতে হুঙ্কার ছাড়ে, দূর হ' মুখপোড়ার দল। বাছাকে নজর দিচ্ছে দ্যাখ না। বলি তোদের পয়সায় ভোম্বু পিত্তরক্ষা করে নাকি ?

আমরা পালিয়ে আসি এক মাত্র নাতির ওপর ঠাকুমার কড়া নজর। পাড়ার সবার কাছে তো বটেই, এমন কি বাড়িতে ফিরিওয়ালা ঢুকলেও বুড়ি দুঃখ প্রকাশ করে, একদম খেতে চায় না ছেলেটা। এরপর বুকের হাড় দেখা গেলে কি উপায় যে হবে !

ভোম্বলদার বাবার বহুকালের মশলাপাতির বিজনেস প্রচুর টাকা পয়সা। অথচ খরচ প্রায় নেই বললেই চলে। বিরাট বাড়িটা প্রায় ফাঁকা। মা নেই। ডায়বিটিস ও আরও কিছু রোগের জন্যে ভোম্বলদার বাবার ভাতের থালায় কারফু জারি হয়েছে অনেক দিন। সুতরাং ভোম্বলদার জন্যেই যা একটু খরচাপাতি। তাতে কেউ নজর দিলে ঠাকুমা সইবে কেন !

কোথাও চোর ধরা পড়েছে শুনলে ভোম্বলদাকে শিকল দিয়েও বেঁধে রাখা যাবে না। ছুটে যাবেই। চোর বেচারা যেন ভোম্বলদার একার সম্পত্তি। শুরু হয়ে যায় প্রহার। সে একটা দেখবার মত। পেলে যেমন কখনো এক ভাবে বল কাটায় না, তেমনি ভোম্বলদাও চোর ধোলাইয়ে নানারকম বৈচিত্র্য খেলিয়ে থাকে। ওই সময় ধারে কাছে

কেউ থাকলে চলবে না। মঞ্চে শুধু মহান ভোম্বলদা আর নরাধম চোর। আমরা শুধু দর্শক।

তোমরা ভাবছ কিল চড় ঘুষি! আরে ওসব তো ছোট কাজ। গ্রামের চৌকিদার আর থানার কনেস্টবলদের একচেটিয়া সম্পত্তি। ভোম্বলদার ব্যাপারই আলাদা। শরীর হালকা হলে ভোম্বলদা প্রথমে আকাশে ছুঁড়ে দেবে। চোর তখন প্রাণপণে চেঁচাবে, বাবারে মারে! আনাড়ী দর্শক এই সময় চোখ বন্ধ করবে। হয়ত ভাববে, এই রে, চোরের সুন্দর মুখটা মাটিতে থেতলে পড়ে আছড়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে দোতালা সমান উঁচু থেকে চোর বাবাজী নামতে থাকে দ্রুত বেগে! আর মাত্র এক ইঞ্চি বাকী। কিন্তু বিভৎস দৃশ্যটা ঘটবার আগেই পাক্কা উইকেট কীপারের ভঙ্গীতে দারুণ একখানা ঝাঁপ দেওয়া শুধু। তারপরেই দেখা যাবে ভোম্বলদার কোলে হালকা চোর দোলে। আমরা মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল সাপোর্টারদের চাইতেও জোরে চেঁচাই —ভোম্বলদা কি জয়—



এরকম বার কয়েক মর্মান্তিক উইকেট কীপিংয়ের পরেই চোর হাউ মাউ করে কেঁদে প্রতিজ্ঞা করবেই বাবু আর ক্যাচ লুফবেন না, এবার

ছেড়ে দিন। জীবনে আর চুরি করব না। আপনার পায়ে পড়ি—

ভোম্বলদা তখন সমবেত দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলবে, হুঁ, একেই বলে হৃদয়ের পরিবর্তন! দেশের আইন আদালত পারে শুধু শাস্তি দিতে। আমার এই টেকনিক একেবারে আধুনিক এবং খাঁটি।

ভোম্বলদার পকেটে সব সময়ই টাকা থাকে। খানকতক নোট চোরের হাতে গুজে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবে, চলে যাও বৎস। সৎভাবে জীবন যাপন করে আমার নাম রেখো। আমার আশীর্বাদ রইল—

এ হেন ভোম্বলদার পাড়ায় কিছু শত্রু আছে। থাকবেই তো। পৃথিবীতে মহৎ কাজের সমালোচনা হবেই—এতো সবাই জানে। তাদের বক্তব্য, ভোম্বল এক নম্বরের ভীতু। চোর ধরা পড়লে তবেই গিয়ে পিটুনি লাগায়। কিন্তু নিজে কখনো চোর ধরেছে? ওতে যে বিপদের সম্ভাবনা। তারা আরও বলে, গত বছরে এই ভোম্বল ওর ঠাকুরমাকে নিয়ে দেওঘর থেকে ফিরছিল, ট্রেনে ডাকাত উঠে সব লুঠপাট করে। এমন কি ভোম্বলের ঘড়ি, ঠাকুরমার সোনার হারও কেড়ে নেয়। কই, তখন কোথায় ছিল ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশ?

শত্রুপক্ষের কথায় ভোম্বলদা মুচকি হাসে। বলে, কি করব, ঠাকুমা তখন মাথার দিব্যি দিল যে। নৈলে মজা টের পাইয়ে দিতাম! হুঁ, আমার নাম—

আমরা বলি, তোমার নতুন এক্সপেরিমেন্টে কিন্তু পাড়ার চোরের উৎপাত সত্যিই কমেছে। তাজা মানুষ ছেড়ে তুমি যদি ডিউজ বল লুফতে তাহলে এত দিনে টেষ্ট ম্যাচে চান্স পেতে!

ভোম্বলদার মুখে এক গাল হাসি, সে কথাটা ওদের কাছে গিয়ে বল না হতভাগারা!

তা ভোম্বলদা একবার একটা বাচ্চা ছেলের কাছে জোর হেরে গেল। সকাল বেলায় ঢাকুরিয়া স্টেশনে পুঁচকে এক পকেটমার পড়ল ধরা। বয়স এগারো বারো। ভারী জেদী। মুখ দিয়ে একটা কথাও বার

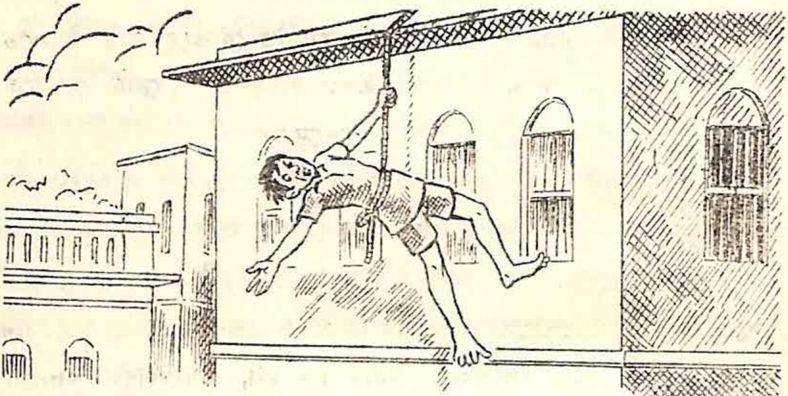
হতে চায় না। এমন সময় ভোম্বলদাকে হৈ হৈ করে ছুটে আসতে দেখে অনেকে প্রমাদ গুণল। কয়েকজন বলল, আহা, ছোট ছেলেকে নিয়ে লোফালুফি কোরো না বাপ। ছেড়ে দাও—

চুপ করুন—ভোম্বলদা গর্জ্জন করে উঠল, হৃদয়ের পরিবর্তন অত সহজ নয়। বিনোবা ভাবে পর্যন্ত ফেল মেরে গেল তা জানেন?

এই বলে ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে ওয়েটিং রুমের দেওয়ালের সঙ্গে ফিট করাল ভোম্বলদা। তারপর প্রচণ্ড একখানা ঘুসির জন্য ডান হাত তুলল। এক সেকেণ্ড! হঠাৎ কি হল, ভোম্বলদা 'বাবারে' 'মারে' বলে বসে পড়েছে আর পুঁচকে ছেলেটা হাসছে। ছেলেটার ভারী টাইমিং জ্ঞান। আচম্বিতে মাথাটা সরিয়ে নিতেই ভোম্বলদার ঘুসিটা গিয়ে পড়ে রেলের শক্ত দেওয়ালে। ঘুসিতে এত জোর ছিল যে দেওয়ালের একখানা ইঁট খসে পড়ে যায় ওপিঠে। সময়টা ছিল মাঘ মাসের সকাল।

এরপর জল অনেক দূর গড়াল। এক্সরে-তে ধরা পড়ল হাতের তিনখানা হাড় ভেঙ্গে গেছে। ছটা মাস এখন প্লাষ্টার বেঁধে গলার সঙ্গে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

চোরটোর ধরা পড়লে ভোম্বলদা আর সেদিকে মাড়ায় না। বোধ হয় ঈশ্বর ওই কঠিন দায়িত্বটা আর কাউকে দিয়েছেন।



ভোম্বলদার ক্যাচ

শহরে দারুণ গরম পড়েছে। তার ওপর লোডশেডিং। রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। অনি ঠিক করেছে, ছাদে শোবে। কারণ বাবা বাড়ি নেই। অফিসের কাজে শিলিগুড়ি গেছেন।

রাত বারোটা। অনি চুপি চুপি শীতল পাটি, বালিশ আর এক-গাছি দড়ি নিয়ে ছাদে এল। আহা, শরীর যেন জুড়িয়ে যায়! তারা ভরা আকাশের তলায় বাতাস ছাদময় হুটোপুটি করছে। তাই না দেখে অনি মুগ্ধ। আর নিচে? গরম, মশা। তার ওপর পাখা চলছে না। অফিস যদি বাবাকে বারো মাসই শিলিগুড়িতে রেখে দিত!

কোমরে দড়ি বেঁধে ছাদে একটা লোহার আংঠার সঙ্গে গিঁঠ দিয়ে অনি শুয়ে পড়ল। ছাদটা ন্যাড়া আর অনির শোওয়া খুব খারাপ। সে জন্যেই বুদ্ধি করে দড়ির সাহায্য নিতে হয়েছে। অনি শুয়ে শুয়ে নিজেকে তারিফ করল। খুব ভোরে উঠে নিঃশব্দে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে মা পরে টের না পায়।

এ পর্যন্ত ভালই ছিল। কিন্তু রাত দুপুরে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' চিৎকারে সব কিছু গুবলেট হয়ে গেল। চিৎকার শুনে পাড়ার সবাই বেরিয়ে এসেছে। একি চোরের গলা? তাই বা হবে কেন চোরেরা কি 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে লোক জড়ো করে? মনে হচ্চে খুব অল্প বয়েসী

বাচ্চা ছেলের গলা। ভিড় জমে গেল। টর্চের সরু হলুদ ফিতে কেবলি নানা জায়গায় ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু শব্দের উৎস সন্ধান করা যাচ্ছে না।

এদিকে অনি প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও, এই যে আমি এখানে, আমাকে টেনে তোল—বাঁচাও—

একজন বলল, মনে হচ্ছে অনির গলা।

—দূর, দূর! অনি ঘুমিয়ে আছে, আমি নিজে দেখে এলাম।

ঠিক এই সময়ে টর্চের বাঁকা আলো গিয়ে পড়ল অনির শরীরে!

সবাই চেঁচিয়ে উঠল ওই তো অনি—ওই তো অনি—

দেখা গেল দোতলার মাঝ বরাবর অনি ঝুলছে বিপজ্জনক ভাবে। অনির তুষারমামা জিজ্ঞাসা করল ওখানে গেল কি করে?

কোন রকমে কান্না চেপে অনি বলল, ছাদে শুয়েছিলাম, হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গেছি।

সবাই সমস্বরে বল, ধন্য ছেলে! বাহাদুর ছেলে!

—বটেই তো, বটেই তো!—ছোকরা দোকানদার মদন বলল: দেখেছেন নাইলনের দড়ি ইয়ুজ করেছে!

তুষারমামা ধমক দিল, ছেলেটা আগে বাঁচুক।

অনি প্রাণপণে দড়ি ধরে চেঁচাচ্ছে। ওর ছোট হাতে কতটুকুই বা জোর।

কিন্তু কি ভাবে রক্ষা করা যাবে সেটাই সমস্যা। ইতিমধ্যে আসরে হাজির হল ঢাকুরিয়া ক্রিকেট ক্লাবের অদ্বিতীয় উইকেট কীপার ভোম্বলদা। ব্যাকিং নেই বলে টেষ্টে চান্স পাচ্ছে না। ভীষণ ব্যাড লাক!

এসেই হাততালি দিল, হুররে, এতো আমার সাবজেক্ট। একজন ছাতে চলে যাও, গিয়ে দড়িটা কেটে ফেল, আমি অনিকে ক্যাচ লুফে নেব।

তুষারমামা বলল, দি আইডিয়া। কিন্তু ক্যাচ যেন মিস না হয়

—আরে না না, আমি লাইফে ক্যাচ মিস করিনি তা জানো ? কিন্তু একজন ক্যামেরাম্যান যে দরকার।

ওই তো ক্যামেরাম্যান। দেখা গেল ফ্ল্যাশবাম্ব আঁটা জাপানী ক্যামেরা নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে তারাপদ। পাড়ার এক নম্বর ফটোতুলিয়ে।

এইবার অ্যাকসন শুরু। তুষারমামা দড়ি কেটে দিল, ভোম্বলদা দারুণ ষ্টাইলে মাটির একইঞ্চি ওপরে অনিকে ক্যাচ করেই ফের শূণ্যে ছুঁড়ে দিল। তারাপদর ক্যামেরাও রেডি। এই সময় আওয়াজ দিল ক্লিক—

হাততালি আর থামতেই চায় না। ভিড়ের ভিতর থেকে কে এক জন মন্তব্য করল, টেষ্টে ভোম্বলদার সিওর চান্স—।

নেমন্তন্ন

মান্নুদের আছে তিন তলা বাড়ি, চার ঘর ভাড়াটে, ফ্রিজ, টেলি-ভিসন আর টেলিফোন। পাছে কেউ গরীব ভেবে বসে, সেজন্যে কারুর সঙ্গে নতুন আলাপ হলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে মান্নু এসব তথ্য জানিয়ে দেয়। তা আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তিন মাস। এই তিন মাসে টেলিভিসন, ফ্রিজ, ভাড়াটে আর টেলিফোনের গল্প কতবার শুনতে হয়েছে।

আমি, নিরু, অধীর, পিলু, বিজয় এক স্কুলে পড়ি। এক ক্লাশে। মান্নু পড়ে বালিগঞ্জের ওদিকে এক নাম করা স্কুলে। সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে রোজ বিকেলে তক্সপুকুর মাঠে আমাদের দেখা হয়। আমরা রবারের বল দিয়ে ফুটবল খেলি। মান্নুরা আগে উত্তর কলকাতায় ছিল। সম্প্রতি তিন তলা বাড়ি বানিয়ে আমাদের পাড়ায় এসেছে। মান্নুর বাবার আছে বড় বাজারে মস্ত বড় কাপড়ের আড়ং।

আমাদের মধ্যে নিরুটা ভারি হ্যাংলা। মান্নুকে দেখলেই বলে, চ', আজ তোদের বাড়ি যাব।

মান্নু কিছুতেই রাজি হয় না। জবাব দেয়, আগে বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হোক, তবে তো তোদের যেতে বলব।

—তা অনুষ্ঠান নাই বা হল। এমনি বুঝি যেতে নেই?

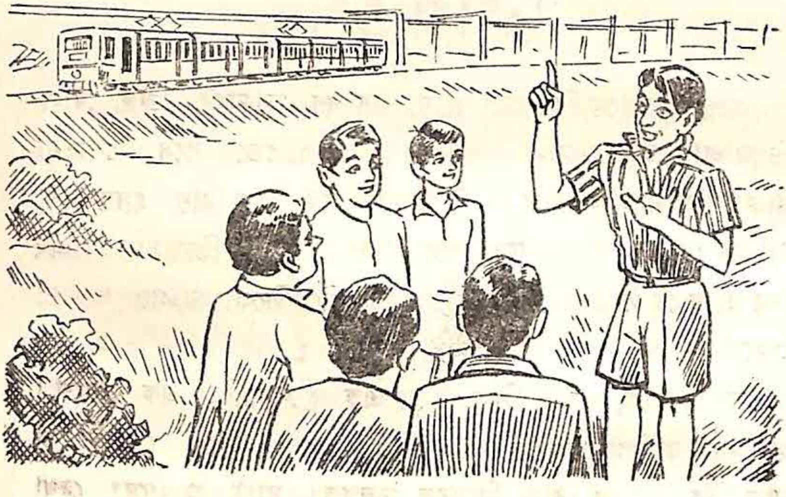
মান্নু আঁৎকে ওঠে

—ওরে বাবা, সেটা হয় না।

উত্তর শুনে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। মান্নুর যে আপত্তিটা কোথায়, সেটা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

সেদিন খেলা শেষ হয়ে গেছে। দক্ষিণ থেকে সুন্দর ফুরফুরে

বাতাস উঠে আসছে। তন্নুপুকুর মাঠের ধারে একটা পুকুর, তার পাশে বসে আমরা গল্প করছি। সন্ধ্যা তখনো হয়নি। একটু আগেই পাঁচটা পয়তাল্লিশের সবুজ রঙের ক্যানিং লোকাল শিস দিতে দিতে হারিয়ে গেছে। এমন সময় এল মান্নু।



—ওঃ, ইস্কুলে আজ দারুণ ফাংসন ছিল। আসতে দেরী হল তাই।

অধীর বলল, কিসের ফাংসন রে?

—সে তো প্রতি সপ্তাহে হয়। তোদের ইস্কুলে হয় না?

—কই, না তো!

মান্নু মুখ বাঁকালো।

—আহা কি নাম, ক্ষেমঙ্করী বিদ্যাপীঠ! ওই ইস্কুলে পড়লে ভবিষ্যৎ একেবারে ঝরঝরে। ছেড়ে দে—

—ঠিক আছে, সামনের বছর ছেড়ে দেব। কিন্তু পরশু দিন তোর ওখানে আমরা যাচ্ছি।—অধীর বলল।

—কেন?

—জানিস না মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ফাইনাল! টিভিতে খেলা দেখব।

মান্নু ফের মুখ বাঁকালো।

—ইমপসিবল।

—কেনরে ?

—ওই সময় আমার মেজদা যোগাসন করে। বাড়িতে হৈ-চৈ হলে ডিস্টার্ব হবে। তাছাড়া তখন অনুষ্ঠানও হচ্ছে না।—মান্নুর সাফ জবাব।

আমরা বুঝিয়ে বলি, তোদের তো মস্ত বড় বাড়ি। মেজদা না হয় অন্য ঘরে যোগাসন করবে। আর অনুষ্ঠানের কি দরকার? আমরা তো আর খেতে যাচ্ছি না।

—উহু—মান্নু অটল : গুহ বাড়ির একটা ট্রাডিসান আছে। সে তোরা বুঝবি না।

আমরা অবশেষে হাল ছেড়ে দি। হায় হায়, টিভিতেও এমন খেলাটা দেখা হল না।

মান্নু একদিন হন্তদন্ত হয়ে এল।

—ওঃ, আজ বাজারে গিয়েছিলাম। সে এক মজার অভিজ্ঞতা!

আমরা মজার অভিজ্ঞতা শুনতে তক্ষুনি গোল হয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে টিভি না দেখার শোক ভুলে গেছি। মান্নু ভাল গল্প বলতে পারে। ও এলে আমাদের ভালই লাগে। মান্নুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাও বেড়ে যায়।

মান্নু বলল, বাবার শরীরটা খারাপ। আমি তাই বাজারে গিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই জেনে গেছে আমি কার ছেলে। মহা মুশকিল—

—এতে আবার মুসকিলের কি ?—পিলু বলল।

—একশোবার মুশকিল—মান্নু রেগে উঠল : আমি কিছুই পছন্দ করতে পারছি না। একজন আমার থলে কেড়ে নিয়ে হু'কিলো ওজনের ইয়া হুটো ইলিশ মাছ ঢুকিয়ে দিল। এক জন দিল কিলোটাক পাবদা মাছ—

—বলিস কিরে, ইলিশ তো এখন বাইশ টাকা করে।

—আরে, তাতেও কি নিস্তার আছে নাকি? গোঁফওয়ালা একটা লোক বলল, বাবু রোজ আমার কাছ থেকে এক কিলো রুই মাছ নেন। আর আপনি নেবেন না? অতএব—

বিজয় জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে বুঝি অনুষ্ঠান ছিল?

—আরে, না না—মান্টু জোরে হেসে উঠল: আমাদের তো রোজই এরকম বাজার হয়।

—তাই নাকি!—আমাদের চোখ গোল্লা গোল্লা হয়ে যায়: এক দিনেই এত মাছ খেয়ে ফেলিস তোরা?

—না না, সব কি আর খাওয়া যায়? ভিখিরী টিখিরী এলে ওদের দেওয়া হয়।

এই সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরু বলল, আহা, যদি ভিখিরী হতাম।

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে এ কথায়।

মান্টু বলল, রোসো, সামনের মাসেই আমার দিদির বিয়ে। দেখব তোরা কত খেতে পারিস।

—সত্যি বলছিস দিদির বিয়ে? তার মানে অনুষ্ঠান?—আমরা জোরে চেঁচিয়ে উঠি।

—আলবৎ অনুষ্ঠান।—মান্টু ঘাড়টা বাঁকাল: গুহ বাড়ির ট্রাডিশন কাকে বলে বুঝবি।

তন্তুপুকুরের কচি কচি ঘাসে নিরু ডিগবাজি খেতে লাগল। অধীর হাত তালি দিল আনন্দে।

—কি কি হবে রে বিয়েতে?

—সে অনেক কিছু—মান্টু বিজ্ঞের মত হাসল: জীবনেও এমন খাওয়া খাসনি তোরা।

—আহা, দু'চারটে আইটেম বল না?

—শোন তাহলে। মাছই হবে চার রকমের। গলদা চিংড়ির

মালাইকারি, দই ইলিশ, রুই মাছের কালিয়া আর ফিশ ফ্রাই। এবাদে মাংস বিরিয়ানি তো আছেই—

নিরুর দুটো চোখের সাইজ অসম্ভব বেড়ে যায়। ইস্কুলের বই ছাড়াও নানা বিষয়ে বিজয়ের পড়াশুনা। অনেক খবর রাখে। বলল, গলদা চিংড়ি তো আজকাল আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে।

—আরে টাকা ফেললে আবার অভাব। ভেড়ীর সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়েছে, লরী করে মাল পাঠাবে। উত্তর প্রদেশ থেকে আসবে এক ওয়াগন কঁচি পাঁঠা।—মান্নু দম নেবার জন্যে একটু থামল।

আহা, জিভ দিয়ে লালা ঝরে আর কি। অধীর বলল, এত জিনিস দিয়ে কি হবে রে?

—তোদের কোন আইডিয়া নেই দেখছি।—মান্নু হাসল: অন্তত চার থেকে সাড়ে চার হাজার লোক খাবে মানে আধুনিক কালের রাজসূয় যজ্ঞ আর কি! শত হলেও বাবার তো একটা প্রেসটিজ আছে।

গুণে দেখলাম আর মাত্র পঁচিশ দিন বাকী। মান্নু ইদানীং একটু কম আসে। আর এলেই দারুণ দারুণ সংবাদ দেয়। যেমন:

—জানিস সব জায়গায় তার পাঠানো হয়েছে। বহরমপুর থেকে আসবে পঞ্চাশ টিন ছানাবড়া, বর্ধমান থেকে টেম্পোতে কাঁচাগোল্লা, কৃষ্ণনগর দুই লরী সরভাজা সরপুরিয়া—ইত্যাদি।

আমাদের চোখ আজকাল ছানাবড়া হয় না। শুধু দিন গোণা আর প্রতীক্ষা। সত্যি, একেই বলে অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে মান্নু এক দিন এসে আমাদের ভোজনাসন শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ক্ষিদে বাড়াবার পক্ষে এ আসন নাকি খুবই কাজের! মান্নুর মেজদা এই ভোজনাসনের জোরেই দেহ প্রতিযোগিতায় সেকেণ্ড হয়েছে।

বাড়িতে মা বলে, খেলা টেলা ফেলে রাত দিন ঠ্যাং ওপরে তুলে হচ্ছে কি?

—তুমি বুঝবে না মা। এর নাম ভোজনাসন।

—ওরে বাবা, একে রেশনের চালে কুলোতে পারি না, তার ওপর ভোজনাসন ! ওসব বাদ দে।

—তা হয় না মা। মানুদের বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে।

নিরু এক দিন বলল, ভোজনাসনে দারুণ উপকার পাচ্ছিরে। ক্ষিদেও ভয়ানক বেড়ে গেছে।

—তাহলে তো মুশকিল—আমি বলি ঃ তুই একাই তো এক লরী সরপুরিয়া সাবাড় করবিরে !

বিজয় আবার একটা ফ্যাকড়া তুলল

—আসলে একটু এদিক ওদিক হলে কিন্তু খুব ক্ষতি হয়। আমাদের উচিত মেজদাকে একবার দেখানো।

কিন্তু মেজদার সঙ্গে আলাপ করবে কে ? যা ভয়ংকর একখানা চেহারা। আমাদের পাত্তাই দেয় না !

পিলু বলল, ক্ষিদে যখন পাচ্ছে তখন ভোজনাসনে ভুল নেই।

আমরা পিলুকে সমর্থন করলাম। এদিকে বিয়ের দিন এসে গেল। আমরা সকাল থেকেই লেগে গেলাম ভোজনাসনে। দুপুরে অল্প একটু খেয়ে পিত্ত রক্ষা করা হল মাত্র। বিকেলে আবার আসন। তারপর সন্ধ্যে হতে না হতেই সবাই রেডি হয়ে মানুদের বাড়ি।

বাতাসে সানাইয়ের সুর। মানুদের বাড়ির সামনে দুটো আম গাছ আলোর ডুম দিয়ে সাজানো হয়েছে। চারদিকে ব্যস্ত লোকজন। হৈ-হট্টগোল। প্যানডেলখানা দেখবার মত। মানু বলল, ছাদে যা, সেখানেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা।

নিরু ফিসফিস করল, বহরমপুরের ছানাবড়া, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, বনগাঁর কাঁচাগোল্লা ঠিকমত এসেছে তো ?

পিলু বলল, আমি বাবা গলদা চিংড়ি খাব। আহা, কত কাল খাই না—

বিজয় ধমক দিল, অ্যাই, হ্যাংলার মত করবি না।

টিফিনের পয়সা জমিয়ে তিন ডজন রজনীগন্ধা কেনা হয়েছে। আমি

মেয়ে মহলে কোনরকমে সেটা পৌঁছে দিয়ে ছাদে এলাম। এক দিকে ঘেরা জায়গায় লুচি ভাজা হচ্ছে। ছ্যাক ছ্যাক আওয়াজ। একটা ব্যাচ শেষ হয়েছে। আমরা বসতে যাব, একটা কালোপানা লোক উঠিয়ে দিল। এখন নাকি বরযাত্রীরা বসবে। কি আর করা। বসার জায়গা নেই। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া দেখতে লাগলাম এক পাশে। মাথার ওপর তারা ভরা মাঘ মাসের আকাশ।

দ্বিতীয় বারেও একই অবস্থা। বলা হল, আরে, তোমরা তো পাড়ার ছেলে। এখন শ্যামবাজার থেকে যারা এসেছে তাদের বসতে দাও।

অধীর ফিসফিস করে বলল, এরপরে বৌবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ হয়ে শেষে আমাদের পালা আসবে নাকি রে? পেট যে চোঁ-চোঁ করছে!

নিরু বলল, গলদা চিংড়ি, দই ইলিশ, সরপুরিয়া—এসব তো দেখতে পাচ্ছি না।

পিলুর আবার সর্দির ধাত। মাঘ মাসের আকাশ থেকে ক্রমাগত হিম ঝরছে। মাথায় রুমালখানা বিছিয়ে দিল বেচারা। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা টনটন করছে ব্যথায়। অল্প জায়গা, পাঁচ পাঁচটা ব্যাচ হয়ে গেছে। যখনই বসে পড়ি, কেউ না কেউ উঠিয়ে দেয়। বিজয় বলল, ভালই তো, এতে আমাদের ক্ষিতে বেড়ে যাচ্ছে। ভাল টানতে পারবি।

কিন্তু পরের ব্যাচে তিনটি দৃশ্য দেখার পর আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। এক জন মাছ চাইলে তাকে দেওয়া হল ইয়া বড় বেগুন ভাজা। একজন চায়ের চামচেতে বোঁদে তুলে বলছে, আর এক হাতা দেব? আর বরযাত্রীরা তো মাংস মাংস করে খুন হয়ে গেল। লেবু আর জল নিয়ে ছু'জন ছু'দিক থেকে ছুটে এল।

হায়রে, এই বিপদের মধ্যে মানুর আর পাত্তা নেই! হঠাৎ মানুর মেজদার কথা ভেসে এল পাশের ঘর থেকে। কাকে যেন বলছে, এই

ছেলেগুলি সেই থেকে হ্যাংলার মত দাঁড়িয়ে আছে। কে এদের নেমন্তন্ন করেছে?

এর পর আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না ঃ

তা সেই রাতে পিলু, অধীর, নিরু, বিজয়ের কপালে কি ঘটল জানি না। আমাকে কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়েছিল ভুলু। বেচারা সন্ধ্যে থেকে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, তার পরে রাত এগারোটায় উঠে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে নাইট ডিউটি দেয়। আমি ছুটতে ছুটতে এসে সেই ডাল-ভাতের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মা হা-হা করে উঠল, ভুলু খাবে কি?

আমি বললাম, প্রভুভক্ত কুকুর, তা প্রভুর জন্যে এটুকু আত্মত্যাগ করতে পারবে না?

মা আর কি করবে! শুধু বলল, তখনই ভোজনাসন করতে মানা করেছিলাম। আমার কথা তো শুনলে না!



হারুর সাধনা ও সিদ্ধি

অনেকের মত হারুর জীবনের সামনেও নানা পথ ছড়ানো। হারু কিন্তু একটা মাত্র পথেই হাঁটতে চায়। সে হল সংগীত শিল্পীর পথে। ভারত বিখ্যাত গাইয়ে হবে হারু। দিল্লী, বোম্বাই, কানপুর, কলকাতা —যে কোন গানের আসরে হারুর নামটা জ্বল জ্বল করবে। ছেলে-মেয়েরা অটোগ্রাফের জন্য লাইন দেবে। কাগজে কাগজে হারুর ছবি—কত কি।

এই সব ভাবতে গিয়ে হারুর আজকাল রাতে ভাল করে ঘুম হয় না। একটু আধটু যা হয়, তার মধ্যে আবার নানা স্বপ্ন এসে উঁকি মারে। এই সেদিন দেখল হারু মস্ত বড় এক জলসায় গান গাইছে। অন্যান্যদের বেলায় বড় গণ্ডগোল হচ্ছিল। কিন্তু হারুর বেলায় যেন শ্মশানের নীরবতা। একটা গান শেষ হলেই নানা দিক থেকে ঝড় ওঠে —আর একখানা—আর একখানা—। হারু একবার গেল রেগে, না, আর একখানাও নয়। এক্ষুণি আমাকে আর একটি জলসায় গাইতে হবে। মাপ করবেন—

হঠাৎ কানে প্রবল আকর্ষণ। ধড় মড় করে উঠে বসল হারু। বাবা কান ধরে আছে শক্ত করে, বলি পড়াশুনার কথা বললেই মাপ করবেন। এসব ছেলের জীবনে কিছু হবে?

হারুর সব চাইতে বড় পিসি নিবিষ্ট মনে জপ করছিল। ভাইপোর দুরবস্থা দেখে চেঁচিয়ে উঠল সেই অবস্থাতেই, আঃ, কানটা ছেড়ে দে নাড়ু—

মা সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল, ওকি, বাছার কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গালে ?

—কাঁচা ঘুম ! এখন নটা বাজে সে খেয়াল আছে ?

বস্তুত গানের পথে একটু হেঁটেই হারু বুঝতে পেরেছে এখানে বহু কাঁটা। তার মধ্যে প্রবল কাঁটাটি হচ্ছে বাবা। প্রতি ক্লাশে দু'তিন বছর করে রেষ্ট নিয়ে এখন ৯ম শ্রেণীতে পড়ছে হারু। কিন্তু তাতে কি ! লেখাপড়ার লাইন তো ওর জান্যে নয়। অধর মেমোরিয়াল শীল্ড ফাইনালে 'রাতের তারা' ক্লাবের গোল কীপার হয়েছিল হারু। সাত মিনিটের ভিতর বার পাঁচেক বলটা গোলে ঢুকে যায়। কোচ বিমলদা সবার সামনেই কানটা ধরে মাঠের বার করে দেয়। না, সেবারেও এতটুকু দুঃখ হয়নি হারুর। বুক দিয়ে বল আটকাতে তো পৃথিবীতে আসে নি। সুরের ঝর্ণাধারার আশীর্বাদ যার মধ্যে কাজ করছে, সে কিনা এই সব তুচ্ছ কারণে মন খারাপ করবে !

একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছে হারু। ও যখন মনে মনে গান করে তখন সুরটা পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কি দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু গলা দিয়ে গানটা বের করলেই কি-একটা ওলট পালট হয়। লোকে বলে, ঠিক যেন পাতিকাকের গলা —।

প্রথম প্রথম হারু খুব দমে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এটাও তো ঠিক, কেউ এক বারে এম এ পাশ করতে পারে না। অ আ ক খ দিয়ে শুরু করতে হয় এবং সেখানেও থাকে প্রচুর ভুল। অতএব মুসড়ে পড়লে চলবে কেন ? চাই সাধনা। একলব্যের মত একাগ্র সাধনা।

হারুর প্রাণের বন্ধু বঙ্কা। ও অনেক আগে উচুঁ ক্লাসে পড়ত।

ফেল করে করে এখন এক সঙ্গে। মা আর বড় পিসির মত বঙ্কাও বন্ধুকে উৎসাহ দেয়। বলে, ফুটবলে একবার লাথি মেরেই পেলে হওয়া যায় না, কিম্বা একবার রেওয়াজেই বড়ে গোলাম আলি—

উৎসাহের কথা শুনলে আপনা থেকেই চোখ বড় হয়ে যায় হারুর। বড় পিসি একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছে। বাবা আফিস চলে গেলেই সংগীত সাধনায় মেতে ওঠে। নিন্দে করা যাদের স্বভাব, তারা বলে, কানের পরিশ্রম হচ্ছে বটে, তবে কাকের দল তো পাড়া ছাড়া হয়েছে। সেটাই বা কম কি।

হারুর সঙ্গে দেখা হলেই আজকাল অনেকের ক্ষিদে লেগে যায়। তা বঙ্কা অকৃতজ্ঞ নয়। পাড়ার সুরেশ কেবিনে চা ও ওমলেট ধ্বংস করে পরামর্শ দিল, তোর ইদানীং অনেক উন্নতি হয়েছেরে। এবার জলসা টলসায় গওয়া উচিত।

—তা কি করে হবে বঙ্কাদা ?—হারু জিজ্ঞাসা করে।

—আরে আমি থাকতে তোর ভাবনা কি। পনেরো তারিখে কপি বাগান মাঠে জলসা হবে। সেক্রেটারী আমার বন্ধু, তোকে চান্স পাইয়ে দেবই।

সে রাতেই স্বপ্ন দেখল হারু। রেডিওতে গান গাইছে আর সারা দেশ উৎকর্ণ হয়ে তাই শুনছে। এখন ওর পাঁচ লাখ গানের রেকর্ড মাত্র সাত দিনে বিক্রী হয়ে যায়। রিকশাওয়ালা থেকে মাননীয় মন্ত্রী —সবার মুখে ওর গান।

তা কপিবাগানের মাঠে কম লোক হয়নি সেদিন. ছোট ছেলেমেয়ে ধরলে শ'খানেকের মত। উদাত্ত কণ্ঠে হারু গান গাইল। চা ডবল ডিমের ওমলেটের লোভ দেখিয়ে বঙ্কা পাঁচ জনকে পাঁচ জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। হারু গান শেষ করতেই ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, আর একখান—আর একখানা—

বেপাড়া থেকে জনা কয়েক আর্টিস্টের আসার কথা। তারা আসছে না। যাক, সময়টা কাটছে। তবু সেক্রেটারীর একবার সন্দেহ হল,

একি গান না মোষের ডাক। বঙ্কা বুঝিয়ে দিল, নতুন ঘরোয়ানা। এ হল শিল্পীর নিজস্ব স্টাইল—

কথা শেষ না হতেই দড়াম করে আধলা ইট পড়ল হার্মোনিয়ামের সামনে। অতএব গানের সেখানেই ইতি।

পরের ভাল যারা সহ্য করতে পারে না তারা তো ইট ছুঁড়বেই। হারু তাতে কিছু মনে করে না। এখন শীতের শুরুতে চারদিকে জলসা টলসা হচ্ছে। বঙ্কা প্রায়ই খবর নিয়ে আসে। বন্ধুর জন্যে কর্মকর্তাদের হাতে ধরে। বলে, একটা চান্স দিন মেসোমশাই—

তবে চালাকিটা অনেকেই বুঝে গেছে ইতিমধ্যে। সেই পাঁচটা পরিচিত মুখ পাঁচ দিক থেকে অনুরোধ জানাবে আর সবাই হাততালি দিয়ে বসিয়ে দেবে—এতেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব সুরেশ কেবিনে পরামর্শ সভা বসল। সুরেশকে আজকাল বলতেও হয় না। ছ'খানা ওমলেট বানিয়ে ফেলে চোখর পলকে। সঙ্গে চা তো আছেই।

বঙ্কা বলে, এই তো বেনের মাঠে জলসা রবিবার। সেক্রেটারী মাধবদা ভীষণ কড়া। শেষে অতিকষ্টে রাজি করিয়েছি। বলেছে, ঠিক একখানা গান গাইবে হারু। ভাড়া করা লোক আনা চলবেনা।

নিতাই বলে, আচ্ছা আমরা যদি নতুন লোক নিয়ে যাই ধর দুই কি তিন জন—

—উঁহু, মাধবদা বুঝে ফেলবে।—বঙ্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে : আর হারুটার একটুও ইমপ্রুভ হল না। এত ঢিল বুঝি আর কোন আর্টিস্ট খায়নি। এবার থেকে বর্ম পরে গাইতে হবে।

হারু বাদে সবাই হেসে উঠল।

ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোককে ইদানীং প্রায়ই সুরেশের কেবিনে দেখা যায়। এক কাপ চা নিয়ে খবরের কাগজখানা খুঁটিয়ে পড়েন। এমন কি দাদের মলমও বাদ দেন না।

তিনি এবার মুখ খুললেন, হু, তোমাদের সমস্যাটি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ও তো পুরানো টেকনিক।

—তাহলে নতুন কিছু বলুন? —বঙ্কা বাঁকা ভাবে তাকাল।

—এক কাজ করতে হবে—ভদ্রলোক চশমার কাঁচ মুছলেন: হারু গান গাইবার আগে ওর সোনার আংটিটা খুলে আমাকে দেবে। আর গান শেষ হলেই মাইকে একজন ঘোষণা করবে, শ্রীমান হারুর গানে মুগ্ধ হয়ে শ্রীহরিপদ হালদার মহাশয় একটি সোনার আংটি উপহার দিচ্ছেন। ব্যাস, আমি ডায়াসে উঠে আংটি পরিয়ে দেব। জোরে হাততালি পড়বে।

শম্ভু লাফিয়ে উঠল, চমৎকার আইডিয়া!

পাঁচু বলল, হ্যাঁ নতুন টেকনিক বটে। কেউ সন্দেহ করবে না।

বঙ্কাও সায় দিল, এতে পপুলারিটি বেড়ে যাবে।

খুশি হয়ে ভদ্রলোক বললেন, ইয়ং আর্টিষ্টদের আমি অলওয়েজ উৎসাহ দিই। সোনার আংটিটা আমারই দেওয়া উচিত ছিল। তবে কিনা আমার টাইমটা এখন খারাপ যাচ্ছে—

হারু বলল, না না, আপনি কেন দেবেন? সুরেশদা এখানে চা ওমলেট দিন।

বেনের মাঠের জলসা শুরু হল রাত আটটায়। পরিস্কার তারা ভরা আকাশ। দক্ষিণ থেকে মৃদু বাতাস উঠে আসছে। তিন জন বেতার-শিল্পীও গাইবে। দু'খানা খাট আর পাড়ার মেয়েদের শাড়ী ধার করে স্টেজ বানানো হয়েছে। বাচ্চা ছেলেরা ঘোড়া ঘোড়া খেলছে। গুটি কয়েক মহিলা বসে আছে এক দিকে। মাধবদা বলল, গান শুরু কর। কেউ ঢিল ছুঁড়বে না।

হারু ভয়ে ভয়ে বলল, আসরটা আর একটু জমলে হত না?

—খুব জমবে—মাধবদা বলল: গান শুরু করলেই লোকজন ছুটে আসবে।

যাই হোক, হারু গান গাইল। ঠিক একখানা। বঙ্কা রেডি। ছুটে গিয়ে মাইকে ঘোষণা করল, সংগীতে মুগ্ধ হয়ে শ্রীহরিপদ হালদার শিল্পীকে এইবার একটি সোনার আংটি উপহার দিচ্ছেন—

সবাই তাকাল। কে হরিপদ হালদার? কাউকে দেখা গেল না। দুইমিনিট—তিনমিনিট—। বঙ্কা কাতর কণ্ঠে বলল, হরিপদবাবু এগিয়ে আসুন, এগিয়ে আসুন—

কিন্তু কোথায় হরিপদ হালদার! হারুর ততক্ষণে কান্না পেয়ে গেছে। মা জন্মদিনে আংটিটা উপহার দিয়েছিল। বাবা টের পেলে আস্ত রাখবে না।

প্রাণের বন্ধু বঙ্কার মুখেও কথা নেই। শুধু সেক্রেটারী মাধবদা বলল, বাড়ি পালা হারু। এও সাধনার অঙ্গ। এই বার তোর সিদ্ধি কে আটকায়!



ঢাকুরিয়ার কাক

অনি এ পর্যন্ত কলকাতার অনেক পাড়ায় বাস করেছে, অনেক রকমের কাকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, কিন্তু ঢাকুরিয়ার কাকেদের মত এমন বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান কাক আর কোথাও দেখেনি। অনি এর সপক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ দিতে পারে। তবে স্থানাভাবে এখানে অল্প কয়েকটি মাত্র প্রমাণ দেবে। তাহলেই ঢাকুরিয়ার কাকেদের চরিত্র তোমরা ঠিকমত বুঝতে পারবে।

অনির জন্মদিনে অখিলবাবু একবার ওকে একটা গুলতি উপহার দিয়েছিলেন। এত জিনিস থাকতে গুলতি উপহার দেওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। প্রত্যেকদিন অফিস যাওয়ার আগে ঘন্টা-খানেক বারান্দায় বসে একটা মোটা খেরো খাতায় অখিলবাবু আত্ম-জীবনী লেখেন। লেখালেখি অনেক দিন ধরেই চলছে। কিন্তু খুব বেশি এগোয়নি। কেননা, ঠিক ওই সময়ে রাজ্যের কাক এসে তারস্বরে এমন কা-কা করতে থাকে যে মাথা ধরে যায়। লেখা হয় পণ্ড। নতুন কোন আইডিয়া মাথায় আসে না। তাই অতিষ্ঠ হয়ে অখিলবাবু অনিকে গুলতি উপহার দিয়ে এর সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, তিন দিনের মধ্যে অন্তত একটা কাককে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে।

কিন্তু ঢাকুরিয়ার কাকেরা ভয়ানক বুদ্ধিমান। উচিত শিক্ষা দিতে গিয়ে অনি নিজেই উচিত শিক্ষিত হয়ে যায়। যাইহোক, অনি কোন রকমে একদিন কার্ণিসে বসা অনমনস্ক একটা কাকের ডান পাটা একটু জখম করে দিল। কিন্তু তার ফল হল মারাত্মক। রাস্তায় বেরলে দল বেঁধে কাকেরা অনির মাথা লক্ষ করে ছুটে আসে। সে এক মহা ঝামেলা!

পাড়ার প্রভাবতী শিশু নিকেতনে অনি পড়ে। কিন্তু ইস্কুলে যাওয়া ডকে উঠল। হয়ত ছ-সাত জন বন্ধুর মাঝখানে টুপি মাথায় ইস্কুলে যাচ্ছে, কাকেরা ঠিক অনিকেই চিনে ফেলে। প্রভাবতী শিশু নিকেতন পর্যন্ত পেছনে পেছনে তাড়া করে যায়। এক দিন তো ব্যানার্জী পাড়ায় মাথা বাঁচাতে গিয়ে রেশন দোকানেই ঢুকে পড়তে হল। এর অর্থ হল, ঢাকুরিয়ার কাকদের মানুষ চেনবার দুর্লভ ক্ষমতা। উপায়ান্তর না দেখে শেষে অখিলবাবু এক কিলো মুড়ি ছাদের ওপর ছড়িয়ে গণভোজ দিলেন। কাকেরা পরমানন্দে সে মুড়ি খেয়ে কৌ-কৌ রবে ঢেকুড় তুলে বিদায় নিল। যাই হোক সে যাত্রা অনি এভাবেই মাথা এবং মান বাঁচাল।

একবার অনির বন্ধু তপুর সখ হল কোকিল ছানা পুষবে। অনি বুদ্ধি দিল, তুই প্রথমে কাকের ডিম জোগাড় কর। তা থেকেই কোকিলের ছানা বের হবে।

—কি করে?—তপু ঠোট ওল্টাল।

—বুঝলি না, কাকের বাসাতেই তো কোকিল ডিম পাড়ে।

তা তপু চটপট কাকের ডিম জোগাড় করে ফেলল। ঘোষপাড়ায় নবারুণ সঙ্ঘের মাঠে একটা ছোট বটগাছে কাকের বৌ ডিম পেড়েছিল। পাড়ার অনেকেই সেটা জানত। একদিন তপু মুখোস এঁটে সাতটা ডিমের ভিতর থেকে একটা ডিম নিয়ে চম্পট দিল। এরপর কাকেদের সমাজে যেন শোকের ছায়া নামল। রাত দিন কা-কা রব। তার মানে

ঢাকুরিয়ার কাকেরা অঙ্ক জানে। সাতের থেকে এক বাদ দিলে ছয় হয়। এটা কিন্তু রিনিও জানে না।

রিনি অনির ছোট বোন। দু' বছর পাঁচ মাস সতের দিন মাত্র বয়েস। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে রিনি একখানা জিলিপি দাঁতে কাটে। খুব ছোট বেলা থেকেই এই অভ্যেসটা ও তৈরী করেছে। তা সেদিন বারান্দায় পা' ছড়িয়ে বসে জিলিপি খেতে খেতে রিনি হঠাৎ কেঁদে উঠল। দৌড়ে গেল অনি। একটা পাজী কাক ছো মেরে জিলিপি নিয়ে গেছে। রিনি তাই কাঁদছে।

একটু পরে ছাদে কাকেদের খুব গণ্ডগোল শোনা গেল। অখিলবাবু বললেন, দেখে আয় তো অনি কিসের মীটিং। কাকেদেরও ইলেকসন হয় নাকি ?

অনি ঘুরে এসে বলল, বাবা, একটা কাককে সবাই মিলে ঠোট দিয়ে খুব ধোলাই দিচ্ছে।

অখিলবাবু বললেন, তা ইলেকসনের টাইমে অমন একটু মারামারি হয়েই থাকে।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। অখিলবাবু অফিসে গেছেন। মা রান্না ঘরে। বেচারা রিনি জিলিপির শোকে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনির ইস্কুল নেই, পাশের ঘরে বসে তাই ছবি আঁকছে। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, রিনির মাথার কাছে সেই কাকটা। অনি ছুটে গেল। ছি, ছি! সকাল থেকে রিনিকে ওরা পেয়েছে কি! কাকটা জিলিপির ভাঙা টুকরো ফেলে রেখে জানালা দিয়ে উড়ে গেল মুহূর্তে।

অনি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত পশু পাখিদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে এবং তা থেকে নানা রকম অর্থ বের করতে ভালবাসে। এই ঘটনা থেকেও চমৎকার একটা অর্থ বের করে ফেলল একটু বাদে।

একটা দুষ্টু কাক রিনির জিলিপি ছিনতাই করেছিল। এই নিয়ে

ওদের সমাজে কথা ওঠে। ছাদে মীটিং বসে। কাকেদের নেতা চোখ পাকিয়ে বলে, ছি ছি, একটা ছোট মেয়ের হাত থেকে জিলিপি কেড়ে খেতে লজ্জা করে না? একটা আক্কেল পর্যন্ত নেই? অতএব শুরু হয়ে যায় শাস্তি। এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে জনা কয়েক গুণ্ডা শ্রেণীর কাক। এর পর নেতার হুকুম হয়, যাও, জিলিপিটা এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

আধমরা কাক বলে, আজ্ঞে স্যার, জিলিপিটা যে আস্ত নেই, একটু খেয়ে ফেলেছি।

নেতা বলে, যেটুকু আছে সেটুকুই দিয়ে এসো—।

পাঁজী কাকটা তাই রিনির কাছে হুকুম তামিল করতে এসেছিল। এতেই প্রমাণিত হয় ঢাকুরিয়ার কাকেদের সমাজে আইন কানুন বড় কড়া। একটু বেচাল হলে আর রক্ষে নেই!



পাখি বসা

অনির কাকা অফিসের কাজে বিলাসপুর গেছে। থাকবে এক মাস। তাই গুরুতর সমস্যাটি বাবার কাছেই পাড়তে হল। সমস্যা হল, গরুর গায়ে হামেসাই পাখি বসে, অথচ মানুষের গায়ে বসা তো দূরের কথা, ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। এটা কি রকম কথা! মানুষ হল গিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। কত জ্ঞান বুদ্ধি। আর তাকেই কি না অবহেলা!

অখিলবাবু অনির কথা শুনে হাসেন। বলেন, মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বটে, তবে দুষ্টু বুদ্ধিও নেহাৎ কম নয়। পাখিরা সেটা জানে। তাই ছায়া মাড়ায় না।

কথাটা অনির মনে ধরে না। বলল, ঠিক আছে, আমার গায়ে পাখি বসিয়ে তবে ছাড়ব।

—ভাল কথা। তাই বলে ফড়িং টড়িং বসলে চলবে না কিন্তু!

—না না, সত্যিকারের পাখি। তুমি দেখে নিও।

এর কিছু দিন পরে অনি একটা বই পড়ে চমকিত হল। তাতে লেখা আছে, শান্তিনিকেতনে নিচু বাংলার বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আপন মনে লেখাপড়া করতেন, তখন

নাকি তাঁর গায়ে বনের পাখি উড়ে এসে বসত। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই অনি দ্বিতীয় দফা মুগ্ধ হল। মন বলল, ইউরেকা!

অনিদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে হালতুর দিকে। অনি এক দিন দুপুর বেলায় একা একা সে রাস্তায় গিয়েছিল। রাজডাঙ্গার কাছে কালো পিচের রাস্তাটা ক্রমশ লাল সুরকির হয়ে শেষে ধানক্ষেতের মধ্যে পড়ে পায়ে চলা পথ হয়ে যায়। সেখানে ভারী চমৎকার একটা বাগান আছে। বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, সফেদা, পেয়ারা—নানা রকম ফলের গাছ। পাশেই পুকুর। সবুজ মখমলের মত ঘাস পুকুরের মধ্যে ঢুকে গেছে অনেকখানি। সুন্দর সুন্দর পাখিরা সারা দিন নাচানাচি করে গাছের ডালে। জল পিপাসা পেলে পুকুরের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। অনি ঠিক করল এই বাগানে এসে এক দিন চুপচাপ বসে থাকবে।

কথাটা তপুর একদম ভাল লাগল না। গায়ে শুধু শুধু পাখি বসিয়ে কি লাভ! এতে বরং জামা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আহা, ময়দানের স্ট্যাচুগুলোর কি চেহারা!

অনি খুশি হয়ে বলল, ওরে বোকা এতে কি মজা তুই বুঝতে পারছিস না! কোন মানুষের গায়ে কখনো পাখি বসে না। বসত অনেক দিন আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গায়ে।

তপু বলল, দ্বিজেন্দ্রনাথ হলেন ঋষি ব্যক্তি। পাখিরা ঋষি আর গরুদের গায়ে বসতে ভালবাসে। আমরা তো কোনটাই নই।

অনি একটু ভেবে বলল, গরু অবশ্য কোনদিনই হতে পারব না, কিন্তু চেষ্টা করলে ঋষি তো হতে পারি। এতে বরং আমাদের উন্নতি হবে।

অকাট্য যুক্তি। তপু রাজি হল। বলল, আহা, আমার গায়ে যদি একটা ময়না বসে। তাহলে খপ করে ধরে ফেলব।

—ছিঃ ছিঃ —অনি চোখ পাকাল ঃ ঋষিদের মত কথাবার্তা বলতে শেখ। কার মনে কি আছে পখিরা সব বুঝতে পারে।

সেই বাগান। পুকুরের ধারে সবুজ ঘাসের জমিতে তুই বন্ধু চোখ বুজে বসে আছে। চারপাশে মুড়ি ছড়ানো। মুড়ির দিকে পাখিরা প্রথমে আকৃষ্ট হবে। তারপরে যেই বুঝতে পাররে এরা তো সাধারণ মানুষ নয়, ঋষি, তখনি গায়ে বসবে। তপুর কিন্তু এসব ঝক্কি ভাল লাগছিল না। কিন্তু কি করবে, বন্ধুত্বের টান। মাঝে মাঝে অবশ্য লুকিয়ে পেয়ারা গাছটার দিকে তাকাচ্ছিল। ওখানে একটা বড় ডাঁসা পেয়ারা ঝুলে আছে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। সূর্য এখন মাথার ওপর। পাখি আর আসে না। এল কাশেমের মা।

—হ্যাগো বাছারা, তোমরা কে ?

অনি সংক্ষেপে পরিচয় দিল। কাশেমের মা বলল, তা কি মনে করে এখানে ?

জ্বালাতন আর কাকে বলে! মনের কথাটা প্রকাশ করল না অনি। শুধু বলল, এই এমনি বসে আছি।

—ভাল। তা আমার ছাগলটার দিকে একটু নজর রেখো বাছারা। গেল মাসে আমার ধাড়ী ছাগল চুরি হয়ে গেছে। তুই কিলো তুধ দিত রোজ।

গাছ পালার ছায়া এবার দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। সূর্য একটু পরেই অস্ত যাবে। হায়, বুড়ির ছাগলের কাছেই পাখিদের জটলা। এদিকে কেউ ভুলেও আসে না। তপু আবার ক্ষিদে একদম সহ্য করতে পারে না। ঋষি হবার ধাক্কায় পা ঝিন্‌ঝিন্ করছে। মাথা ভন্ ভন্। অনি এই সময় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। তপু তাকিয়ে দেখে ওর কানের কাছে মস্ত একটা জোঁক কিলবিল করছে। হায় হায়, এখন উপায়! ভাগ্যিস সেই সময় কাশেমের মা ছাগল নিতে এসেছিল। একটানে

তুলে ফেলল। তারপর কষে ধমক দিল, শিগ্‌গরি বাড়ি যাও খোকারা। পড়াশুনা ফেলে এখানে এসে নকশা হচ্ছে! দেব বাবাকে বলে।

ফেরার পথে অনি বেচারাকে দেখে খুব কষ্ট হল তপুর। অনেক রক্ত খেয়েছে জোঁকটা। বলল, কিছু ভাবিস না অনি। ঋষিদের গায়েও প্রথম প্রথম জোঁক বসে। তারপরে সাধনায় উত্তীর্ণ হলে বসে পাখি!

অনি কথা না বাড়িয়ে খোঁচাটা হজম করে নিল।



যেখানকার যা

ঢাকুরিয়ার বিম্বিসারবাবুকে সবাই চেনে। বড় ভাল মানুষ। সাতে নেই পাঁচে নেই। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরনে সব সময়। এক কালে ভাল ছাত্র ছিলেন। চাকরীও করেন মোটামুটি ভাল মাইনের। ঘরে স্ত্রী আছে, আর একমাত্র ছেলে। সুখের সংসার। তবে বিম্বিসারবাবুর শরীরটাই মাঝে মাঝে বাগড়া দেয়। রোগা লিকলিকে চেহারা। আরে, এই চেহারায় কত লোক সেঞ্চুরি পার করে দিচ্ছে। ডাক্তার বাবুরা তো হামেশাই বলেন, চর্বিযুক্ত মোটা চেহারাই নাকি রোগের ডিপো। কিন্তু বিম্বিসারবাবুর বেলায় সব বুঝি উল্টো। রাত আটটার পরে ষ্টেশনের কাছে ডাক্তার বাগচীর চেম্বারে তাই নিত্য হাজিরা দিতে হয়। এখানেই আমাদের সঙ্গে আলাপ।

বিম্বিসার বাবু স্বাস্থ্য বইতে যা যা লেখা থাকে, ডাক্তার বাবুরা যা যা বলেন, সব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। এর ওপর বিম্বিসার বাবুর আছে নিজস্ব ধ্যান ধারণা। এগুলি নাকি অভিজ্ঞতার নির্যাস, স্বাস্থ্যের পক্ষে যা একান্ত জরুরী। হায়, তবু ডাক্তার বাগচীর কাছে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই হয়। কপিলবাবুর কাছ থেকে নিতে হয় ইঞ্জেকসন। বাড়িতে শিশি বোতলের পাহাড়। আর কত যে ট্যাবলেট ক্যাপসুল ধ্বংস করছেন তার লেখাজোকা নেই।

সেদিন বাজারের মধ্যে বিম্বিসারবাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন, এক্ষুণি কফিটা ফেরৎ দিয়ে আসুন।

আমি তো অবাক। কফি ফেরৎ দেব কি। নগদ আশি পয়সা দিয়ে তাজা বড় সড় ফুলকফিটা কিনেছি। বিম্বিসারবাবু বললেন, ওঠা তো ধাপার কফি মশাই। মানুষে খায়? এই দেখুন আমারটা —ফ্রেস ফ্রম মণিরামপুরস গার্ডেন্!

—আজ্ঞে, আমি তো কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না?

—পাচ্ছেন না? তাহলে একটু ঘ্রাণটা নিন।

নিলাম। উহু। ছুটো কফির গন্ধ একই রকম। রং-ও তাই। ছুটোর পাতাই দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি।

অফিস লেট হয়ে যাচ্ছিল। বিম্বিসারবাবু আর দাঁড়ালেন না। তার আগে অবশ্য উপদেশ দিলেন, চোখ আর নাকটা একবার ডাক্তার বাগচীকে দেখাবেন।

পর দিন মূলো কিনতে গিয়ে আবার ফ্যাসাদ। বিম্বিসারবাবু পেছন থেকে জামা টেনে ধরলেন, ওসব কিনবেন না আসুন চম্পাহাটির মূলো দেখিয়ে দিচ্ছি! একবার খেলে ঝাঁকা সুদ্ধু কিনে নিয়ে যাবেন।

রবিবার। ঢাকুরিয়া ষ্টেশনে ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন বিম্বিসারবাবু। জিজ্ঞাসা করলাম, বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি?

—আরে না না। অত টাইম কোথায়? বিশেষ কাজে একটু চাকদা যাচ্ছি।

—তা বিশেষ কাজটা কি?

বিম্বিসারবাবু হঠাৎ রেগে উঠলেন, বাজারে সব জোচ্চোর মশাই। বেজায়গা থেকে বেগুন এনে বলে কিনা, চাকদার বেগুন। আমার সঙ্গে চালাকি! আজ তাই খোদ চাকদা থেকেই বেগুন আনব।

আমি বললাম, কিন্তু গাড়ি ভাড়া যে অনেক পড়ে যাবে। সময়ও লাগবে।

—তা লাগুক না। তবু যেখানকার যা তার একটা মূল্য আছে

মশাই। আলাদা টেষ্ট। নইলে বেশি পয়সা দিয়ে লোকে মজঃফরপুরের লিচু, বেনারসের ল্যাংরা খেত না।

ট্রেন এসে গেল। নাহলে আরও অনেক লেকচার শুনতে হত।

বিম্বিসারবাবুর বাড়িতে মাঝে মাঝে যাই। তাঁর স্ত্রীকে বৌদি ডাকি। সেদিন যেতেই বৌদি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, ঢাকুরিয়ায় চিঁড়ে পাওয়া যায় না?

—কেন, ক' মন চাই?

—দেখুন কাণ্ড, একশো চিঁড়ে আনতে বলেছি, বাবুর আর পাত্তা নেই। ঘন্টা তিনেক বাদে এলেন খিদিরপুর থেকে চিঁড়ে কিনে।

আমি বললাম, তবু যেখানকার যা তার একটা স্পেশাল গুণ আছে বৈ কি।

—রাখুন তো স্পেশাল গুণ! বাড়িটা যে এদিকে স্পেশাল হাস-পাতাল হয়ে গেল। আমি ওসব কিছুই মানি না, তা আমার চেহারা কি কম?

কথাটা সত্যি। ধাপার পুষ্ট কফি পাতার মতই বৌদির স্বাস্থ্য। পাঁচ ফুট বাই চার ফুট।

শুনেছি বৌদির বাবা নাকি বিয়েতে মোল্লারচকের বদলে মোল্লা-খালির দই আনিয়েছিলেন। সেজন্য বিম্বিসারবাবুর অনেকদিন শ্বশুরের মুখদর্শন করেননি।

যেখানকার যা তার জন্যে বিম্বিসারবাবুকে অনেক মাশুলও দিতে হয়েছে বৈ কি। একবার শান্তিনিকেতন থেকে বৌদি বলুকে নিয়ে ফিরছিলেন। বর্ধমান ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই মনে পড়ে গেল সীতাভোগ মিহিদানার কথা। কিন্তু স্টেশনে কখনো ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। অথচ গাড়ি দাঁড়াবে মাত্র দশ মিনিট। এক রিকশাওয়ালা বেশি ভাড়ার লোভে পরামর্শ দিল, কিছু ভাববেন না বাবু, আমি পাঁচ মিনিটেই ফিরিয়ে আনব।

রিকশাওয়ালার ভাইয়ের এক মিষ্টির দোকান আছে। সেটা বেশ

একটু দূরে। সেখান থেকে সীতাভোগ মিহিদানা কিনে যখন ফিরলেন তখন ট্রেন চলে গেছে। রিকশাওয়ালা এক গাল হেসে বলল, বাবু পরের গাড়িতে যাবেন—

—তোর মুণ্ডু। —বিম্বিসারবাবু হায় হায় করে ওঠেন। টিকিট টাকা পয়সা সব যে তাঁর কাছে। তিন ঘণ্টা বাদে পরের ট্রেন। আবার লেট হলে তো সোনায় সোহাগা!

বিম্বিসারবাবু বলেন, যেখানকার যা তা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। কলকাতাতেও টবে অঙুর ফলানো যায়। কিন্তু হায়দ্রাবাদের আঙুরের মত তাতে না থাকবে ভিটামিন না থাকবে টেষ্ট। আর খেয়ে যদি শরীরে কোন কাজেই না লাগে তাহলে ছাই ভস্ম গিলে কি লাভ?

ঠিক ওই কারণে হরিণাঘাটার দুধ এখনও বাড়িতে ঢোকেইনি। শুনেছি, সেবার হাওড়ায় রেল ষ্টেশনে পুলিসের হেফাজত থেকে বৌদি বলুকে উদ্ধার করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। বিম্বিসারবাবুর চায়ের নেশা অত্যন্ত প্রবল। বাড়ি ফিরে এক কাপ চা খেতে চান শুধু। বৌদি গম্ভীর হয়ে বলে, চা-টা এখন হবে না।

—কেন?

—আমার ভাই দার্জিলিং গেছে। সেখান থেকে চা এলে তবে চা হবে।

—সে তো পাঁচ ছ' দিন লেগে যাবে।

—তা তো লাগবে। তবু যেখানকার যা তা না খেলে ভীমের মত শরীরটা টিকবে কেমন করে?

জবাব শুনে বিম্বিসার বাবু গুম হয়ে বসে থাকেন।

আমার বন্ধুরা

অনেক দিন আগে আমরা চেতলায় ছিলাম। তখনকার চেতলার চেহারা অন্য রকম। চেতলা হাটের মাঝখানে একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি। বাড়ির পাশেই একটা তাল গাছ। সেই গাছে বাসা বেঁধে ছিল ছ'টা হনুমান। এটাই একমাত্র বাসা কিনা জানি না, তবে দেখতাম বেশির ভাগ সময়ই ওরা গাছে বসে আছে।

যা বলছিলাম। ওই দোতলা বাড়িতে আমরা যখন ভাড়াটে হয়ে যাই তখন ভরা শীতকাল। আমরা তিন ভাই বোন ছাদে পড়তে যেতাম। কিন্তু পড়া হত না। কেননা, ছাদটা ছিল ভারী চমৎকার। চব্বিশ ঘণ্টা ফুরফুরে বাতাস। তখন চেতলায় বেশির ভাগই ছিল টিনের বাড়ি। ফলে দৃষ্টি কোথাও বাধা পেত না। সামনেই আদি গঙ্গা—সরু ফিতের মত। কালীঘাটের মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

হঠাৎ আমাদের এক দিন কান্না পেল। সকাল বেলা কার্নিশে হেলান দিয়ে ওই সব দেখছি, হঠাৎ ছোট বোন রিনি চেঁচিয়ে উঠল। দেখি হনুমানরা আমাদের সব বই নিয়ে তালগাছে বসে আছে।

সোরগোল শুনে বাবা উঠে এলেন। বললেন, পড়া ফেলে যেমন হা করে তাকিয়ে থাক তেমন বেশ হয়েছে!

এর কিছু দিন পর হনুমানরা এক বয়ম আচার নিয়ে গেল তাল গাছে। মা হায় হায় করে উঠল। আচার তো গেলই, এমন বয়মটাও ভেঙে খান খান করে ফেলবে। কিন্তু অতটা ক্ষতি করেনি। চেটেপুটে খেয়ে বয়মটা আবার ছাদে রেখে গিয়েছিল। আমাদের বইগুলিও খোয়া যায়নি। এখন আমরা ছাদে যাই বটে, কিন্তু হা করে তাকিয়ে থাকি না। পড়ি। বাবা বলেন, ভারী সুবিবেচক হনুমান, তোমাদের উচিত শিক্ষা দিল।

এক দিন মা ছাদে বিছানাপত্তোর শুকোতে দিয়েছে। শীতকালে রোদ খেলে রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে আরাম হয়। তা বেলা পড়ে এলে মা বলল, নাও তোমরা বালিশ লেপ ধরাধরি করে নিয়ে এসো।

ওমা ! ছাদে গিয়ে দেখি হনুমানরা বালিশ মাথায় দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। কয়েক জন আবার লেপও গায়ে দিয়েছে। আমাদের দেখে বিরক্ত হল। যেন চোখ পিট পিট করে বলতে চাইল, আঃ, দিলে তো কাঁচা ঘুমটার দফা রফা করে।

হনুমান গুলো যে আমার কত বড় বন্ধু ছিল তার পরিচয় সেবারই মিলে গেল। সে বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে সেজকাকা আমাকে একটা সত্যিকারের ঘড়ি উপহার দিয়েছিল। ঘড়িটা সব সময় আমার হাতেই থাকত, এক ঘুমোবার সময় ছাড়া। একদিন দুর্গাপুরের পোলের কাছে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম।

ফেরার পথে দেখি একটি—মেয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে ! ভাবলুম যাই পৌঁছে দিয়ে আসি। দুর্গাপুরের পোলের ওপর উঠতেই কেমন যেন গাটা ছম ছম করে উঠল। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ কে পেছন থেকে আমার জামাটা টেনে ধরল। তাকিয়ে দেখি বিচ্ছিরী চেহারার কটা লোক। এক জন বলল, ছেলেটা তো ভারী পাজী, নে এবার ছোরাটা বের কর।

ঠিক তখনি অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। গাছের ডাল থেকে হনুমান গুলি লাফিয়ে পড়েই ঘাড় কামড়ে ধরল তিন জনের। ধাড়ী হনুমানটা মেয়েটার গালে রাম চড় কষিয়ে দিল। লোকগুলি 'বাবারে' 'মারে' বলে দৌড় লাগাল যে যেদিকে পারে।

পরে জেনেছিলাম মেয়েটি ওই দলেরই পথচারীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পোলের উপর নিয়ে শেষে এভাবে ছিনতাই করে।

বহু কাল পর সেদিন চেতলায় গিয়েছিলাম। আজ সি এম ডি এ কি চেহারাই বনিয়ে দিয়েছে ! কেওড়াতলার কাছে বিরাট কংক্রিটের সেতু। বড় বড় রাস্তা। বস্তি, টিনের বাড়ি আর নেই। চেতলাকে যেন চেনাই যায় না। তবে আমাদের পুরোনো দোতলা বাড়িটাকে দেখলাম। পাশেই তালগাছটা ! আমার প্রিয় বন্ধুরা কোথায় চলে গেছে কে জানে !